

શતોષી

મહાત્મા ગાંધી



মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ

العلماء ورثة الانبياء , علماء اعلمى كادنا لدى اسرائيل — حديث

“আলেমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী, আমরা মওলানাব আলেকজান্দার বংশীয়
পয়গম্বরগণের সমর্থক।” হুজবত মোহাম্মদ।

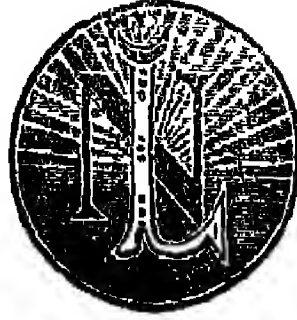
রেজাউল করীম এম. এ. বি. এল.
প্রণীত

নূর লাইব্রেরী : পাবলিশার
১২।১ সাবেঙ্গ লেন, কলিকাতা

সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ১২ টাকা

প্রকাশক :
মঈনউদ্দীন হোসয়ন বি-এ
নূর লাইব্রেরী, পাবনাশার
১২১ সাবঙ্গ লেন, কলিকাতা।



প্রথম সংস্করণ

১৯৪২

জী- ২০৬
Acc 22258
২৬ অগ/২০০৬

মুদ্রাকৰ :
শ্রীশৈলেন্দ্ৰনাথ গুহৰায় বি-এ
শ্রীসবস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপাব মাকুলাব বোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

পরলোকগত পিতৃদেবের

পুণ্য স্মৃতিতে তাঁহার আত্মার

কল্যাণ কামনায়

এই পুস্তকটি

বাংলাব

তকণ ও তকণীদেব কবকমাল

উৎসর্গ করিলাম

বেজাউল কবীম

সূচীপত্ৰ

| | |
|--|-----|
| সূচনা | ১ |
| জন্ম, বংশ পৰিচয় ও বাল্যজীবন | ৮ |
| প্ৰতিভাৰ উন্মেষ | ১৭ |
| “আল্ হেলালেব” জন্ম | ২৩ |
| অসহযোগ আন্দোলনেৰ যুগ | ৩৭ |
| গঠনমূলক কাৰ্য্য | ৬৮ |
| ৰামগড় বাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণ | ৭৭ |
| মুসলিম লীগেৰ অভিযোগ ও তাহাৰ স্বৰূপ | ৮৯ |
| মণ্ডলানাৰ ধৰ্ম্মমত | ৯৯ |
| মণ্ডলানা আজাদেৰ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য | ১১৫ |
| পৰিশিষ্ট | ১২৪ |

ভূমিকা

মহাপুরুষ মৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানি সম্বন্ধে একজন লেখক তুংগ কবিতা বলিয়াছেন যে, অত বড় বিপ্লবী মানুষকে তাঁহাব জীবদ্দশায় মুসলমান সমাজ ভাল কবিতা চিনিতে পাবে নাই। তাঁহাব বিপ্লবী আদর্শ, প্রচণ্ড তেজ, অদম্য সাহস ও মৌলিক চিন্তাধারার সুযোগ মুসলমান সমাজ সম্যকভাবে গ্রহণ কবিতে সক্ষম হয় নাই। তাই তাহাদেব কল্যাণেব জগৎ তিনি জীবন উৎসর্গ কবিতাছিলেন, তাহাদেব অনেকেই তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত শান্তি দেব নাই। আবব, মিসব পাবস্ত, তুবস প্রভৃতি দেশেব মুসলমান সমাজ ও বক্ষণশীল নেতাগণ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদেব চক্রান্তে পড়িতা তাঁহাকে গৃহ হইতে গৃহান্তবে, দেশ হইতে দেশান্তবে বিতাড়িত কবিতা বেড়াইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাব প্রাণ নাশেব ষড়যন্ত্র কবিতাছে, নির্বাসন, কাবাগাষ—এসবও তাঁহাব ভাগ্যে বহু বার হইয়াছে। দেশে-বিদেশে সর্বত্র তাঁহাকে অসুখ নির্যাতন ভোগ কবিতে হইয়াছে। তাঁহাব বচিত পুস্তকাবলী মুসলিম প্রধান দেশেও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাব প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা কেহ নির্বাপিত কবিতে পাবে নাই। তাঁহাব মৃত্যু বহু যুগ পবে নিকট-প্রাচ্যেব প্রত্যেক দেশই বুঝিতাছে যে, তাঁহাব মত সমাজ-হিতৈষী মুসলমান খুব কমই জন্মিতাছেন। যখন তাহাবা তাঁহাব বিপ্লবী মনেব পবিচয় পাইল, তখন তাহাবা তাঁহাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ কবিল। কিন্তু তখন তিনি অন্তলোকে চলিতা গিতাছেন।

যাহাবা একদা জামাল উদ্দীনেৰ অমূল্য গ্ৰন্থবান্ধি বাজেয়াপ্ত কৰিযাছিল, তাহাদেৰই উত্তৰাধিকাৰিগণ বহু ব্যয় কৰিয়া সাদৰে সেই সব গ্ৰন্থ পুনৰ্মুদ্রিত কৰিয়াছে। আজ মুসলিম জগতেৰ প্ৰত্যেক কেন্দ্ৰে মহাডম্বে তাঁহাব স্মৃতি বক্ষাব ব্যৱস্থা হইয়াছে। প্ৰত্যেক দেশেই এই ভাবে যুগান্তকাৰী মনীষীদেবকে প্ৰথম জীৱনে বহু নিৰ্যাতন সহ কৰিতে হইয়াছে, এবং পৰবৰ্ত্তীকালে তাঁহাবা এই ভাবেই সম্মানও পাইযাছেন। নবযুগেৰ দ্বিতীয় জামাল উদ্দীন মওলানা আবুল কালাম আজাদ সপক্ষেও এই কথাই বলা চলে। মনীষী আবুল কালাম আজাদ জামাল উদ্দীনেৰ মতই সমগ্ৰ জীৱন দেশ ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত কৰিযাছেন। তাঁহাব সমাজ-সেবা মখেৰ সমাজ-সেবা নহে। একদল নেতা আছেন যাহাবা প্ৰথম জীৱন চাকৰী-বাকৰী কৰিয়া, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য কৰিয়া কোটি-পতি, লক্ষ-পতি হইয়া পৰিণত জীৱনে সুলভ বাজনীতিৰ ব্যবসায় কৰিয়া দেশ বিদেশে সুনাম অৰ্জন কৰেন। মওলানা আজাদেৰ বাজনীতি ও দেশ-সেবা সে ধৰণেৰ নহে। তিনি জানিতেন, দেশ-সেবাৰ পথৰ ভেঁৰে বিপদ সঙ্কুল,—আব জানিখা শুনিখাই তিনি এই পথই বাছিয়া লইযাছেন। কখনও কাহাবও অনুগ্ৰহেৰ প্ৰত্যাশী হন নাই, কখনও নেতৃত্বেৰ অভিলাষী হন নাই। দেশ ও সমাজ সেবাৰ জন্মই তিনি জীৱনকে উৎসৰ্গ কৰিয়া দিযাছেন। সেই স্কুমাৰ বাল্যকাল হইতে অজাবধি একটা স্মৃদান আদৰ্শকে অবলম্বন কৰিয়া গডিযা উঠিযাছেন। সমাজেৰ বিভিন্ন স্তৰে যখন বাজনীতি-জ্ঞানেৰ উন্মেষ হয় নাই, তখন সুদক্ষ গুৰুৰ মত তাহাকে বাজনীতি শিক্ষা দিযাছেন। যখন প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মতবাদ সমাজেৰ পৰতে পৰতে প্ৰবিষ্ট হইয়া তাহাব চৈতন্যোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল, তখন তিনি

সমস্ত বিপদ ও দুৰ্ভগ স্বীয় স্বন্ধে লইয়া সমাজেব মনোবৃত্তিব পৰিবৰ্ত্তন কৰিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইসলামেব আদৰ্শ সম্বন্ধে যখন সমাজেব ধাবণা অত্যন্ত সঙ্কীৰ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন মওলানা আজাদ তাঁহাব অপূৰ্ব পাণ্ডিত্য প্ৰভাবে সমাজেব সেই ধাবণা দূৰ কৰিবাব জন্ত দিনেৰ পৰ দিন অক্লান্ত ভাবে লেখনী পৰিচালনা কৰিয়া বহুলাংশে সফলকাম হইয়াছিলেন।

ইউৰোপীয় সাম্ৰাজ্যবাদ যখন বিশ্ব-মুসলিমকে নানা প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰেৰ দ্বাৰা এক এক কৰিয়া গ্ৰাস কৰিতেছিল, তখন এই শাস্ত্ৰজ্ঞ মওলানা আজাদ—প্ৰাণেব ভয় না কৰিয়া বাজবোষে পতিত হইবাব ভয় না কৰিয়া—অকুণ্ঠিত চিত্তে মুসলমানেব সম্মুখে তাহাদেব আসন্ন বিপদেব কথা প্ৰকাশ কৰিয়াছিলেন। আন্তৰ্জাতিক পৰিস্থিতিব পট-ভূমিকা ব্যতীত ভাৰতীয় সমস্তাব আলোচনা কৰা চলে না, এই মহা সত্য তিনি বহু পূৰ্বে দেশবাসীৰ নিকট নিবেদন কৰিয়াছিলেন। ত্ৰিপলি যুদ্ধ ও বলকান যুদ্ধেব সময় তিনি ভাৰতীয় মুসলমানেব নিকট এক নূতন তথ্যেব সন্ধান দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, ভাৰতেব স্বাধীনতা ব্যতীত নিকট-প্ৰাচ্যেব কোন মুসলিম প্ৰধান দেশ নিৰাপদ নহে। বিগত প্ৰথম মহাসমবেব পৰ তাঁহাব এই কথাৰ সাৰ্থতা পৰিষ্কাৰ ভাবে বুঝা গেল। খিলাফত যখন বিপন্ন, মিত্ৰপক্ষীয় শক্তিৰ্গ যখন গোপনে গোপনে সমগ্ৰ তুৰ্কি সাম্ৰাজ্যকে নিজেদেব মধ্য ভাগ-বাঁটোয়াবা কৰিবাব জন্ত হীনতম ষড়যন্ত্ৰ কৰিতেছিল, তখন আঁৰ কেহ নহে—এই মওলানা আজাদই ভাৰতীয় মুসলমানকে তাহাব আশু বিপদেব সঙ্কেত ধ্বনি দিতে একটুকুও কুণ্ঠিত হন নাই। আজ যখন সাম্ৰাজ্যবাদেব ভেদনীতিব কুপ্ৰভাবে ভাৰতীয় মুসলমান সমাজেব মধ্য দাস-মনোভাব বিষেব মত ক্ৰিয়া কৰিতেছে, তখনও মওলানা

আজাদ স্বদেশ চিকিৎসকেব মত সেই প্রাণান্তক বিষেব প্রভাব হইতে সমাজকে বক্ষা কবিবাব জন্তু আশ্রাণ চেষ্টা কবিতেন। বিলাস্ত সমাজকে সংপথে আনিবাব জন্তু তিনি যে পতাকা হাতে লইয়াছিলেন, আজিও তাহা অবনমিত কবেন নাই। কত ঝড় আসিয়াছে, কত বিপদেব সম্মুখীন হইয়াছেন, কত নির্যাতন সহ্য কবিয়াছেন—কিন্তু মওলানা আজাদ এক চুলও নিজেব আদর্শ ও পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই একটি মানুষ—যিনি সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, যিনি নিজেব ব্যক্তিগত স্বথেব দিকে কখনও দৃকপাত কবেন নাই—নিজেব বলিতে যাঁহাব কিছুই নাই,— এই লোক যে কোন দেশেব ও যে কোন জাতিব শ্রদ্ধা ও গোববেব আশ্রয়। এমন একাত্ম ভাবে দেশ ও সমাজ-সেবাব দ্বিতীয় উদাহরণ মুসলমানদেব মধ্যে আর নাই। কিন্তু এহেন মনীষীৰ ভাগ্যে জামাল উদ্দীনেব মতই জুটিয়াছে শুধু লাঞ্ছনা, নির্যাতন। একদিকে সবকাবাব কল্পনীতি, আর একদিকে অন্ধ সমাজেব লাঞ্ছনা—এই দুই দিকেব চাপ তাঁহাকে রুদ্ধশ্বাস কবিতেন চাহিয়াছিল। কিন্তু প্রদীপ্ত সত্যকে কেহ নির্বাপিত কবিতেন পাবে নাই। তাঁহাব বিপ্লবী-মন সমাজ বদান্ত কবিতেন পাবে নাই। তাঁহাব চিৰ বিদ্রোহী অন্তৰ সবকাবকে শশব্যস্ত কবিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামেব এই বীর পুৰোহিতকে বহু বাব কাবাববণ কবিতেন হইয়াছে। আর বিপ্লবাত্মক ভাবধাবা প্রচাবেব জন্তু এবং সমাজেব গতানুগতিকতাৰ মূলে আঘাত কবাব জন্তু তাঁহাকে সমাজেব তবফ হইতে নিন্দাপ্রানি কম সহ্য কবিতেন হয় নাই।

বাজনৈতিক সভামঞ্চে মওলানা আজাদেব বক্তৃতা শুনিলে মনে হয়,

এমন তেজ—এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা—এমন সূগভীব বাস্তব জ্ঞান বুঝি আর কোথাও নাই। আবাব ধর্ম সভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে মনে হয়, ইসলামের এমন উদার ও মহান ব্যাখ্যাও যেন কোথাও শুনি নাই। কি গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান, রাজনীতির কি অন্তর্ভেদী সমালোচনা, ইসলামের প্রতি কি অকৃত্রিম অনুবাগ। এই একটি লোক যাহাকে সাম্রাজ্যবাদ কখনও বিভ্রান্ত কবিতে পারে নাই, স্বগিক সুখ সুবিধার মোহ কখনও যাহাকে কর্তব্যচ্যুত কবিতে পারে নাই। তিনি নিন্দা, গ্রানি, অত্যাচার, নির্যাতন—সবই সহ্য কবিয়াছেন, কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া জানেন তাহা হইতে কখনও স্থলিত হন নাই। গড্ডালিকা শ্রোতে ভাসিয়া গেলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন কত সুখকর হইত, ঐহিক বিষয়ে তিনি কত লাভবান হইতেন। কিন্তু কোনও দিন তিনি নিজের আদর্শের ও বিবেকের বিকক্ষে যান নাই। মুসলমান সমাজ ধন্য যে, তাহা বা আবুল কালাম আজাদের মত একজন সত্যের চির উপাসক ও আদর্শের একনিষ্ঠ সেবককে তাহাদের মধ্যে পাইয়াছে। কিন্তু এহেন মহা মনীষীর প্রতি মুসলমান সমাজ সদ্যবহার কবে নাই। যাহা বা জামাল উদ্দীনকে লাক্ষিত কবিয়াছে, যাহাদের ধর্ম-গুরু কামাল পাশার মত প্রচণ্ড বিপ্লবী বীরের মস্তক বিক্রয় কবিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের উত্তরাধিকারীদের নিকট আব কি আশা করা যাইতে পারে? কিন্তু ভবিষ্যতের উদ্বোধিত সমাজ দেগিবে (যেমন দেখিয়াছে জামাল উদ্দীনের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারিগণ) যে, যে যুগে ধর্মাত্মতা সমাজকে পাইয়া বসিয়াছিল, যে যুগে মুসলমান সমাজ মেকি ও নকল বস্তুর মোহে সাম্রাজ্যবাদের কৃতদাস হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সাম্রাজ্যবাদের পদতলে আত্মবিক্রয় কবিয়াছিল, সেই যুগে সেই সমাজের মধ্যে

আবুল কালামের মত মনীষী উদ্ভূত হইয়া তাহাদের সম্মুখে একটা মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাদেরকে দেখাইয়াছিলেন যে, গতানুগতিকতার পথে সমাজের মঙ্গল নাই—তাহাদেরকে এমন একটা পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা প্রত্যেক যুগের বিপ্লবী ও দূরদর্শী নেতারা দিয়া থাকেন। তখন হযত আমাদের উত্তরাধিকারিগণ এ যুগের সমাজকে এই বলিয়া ধিকার দিতে থাকিবে যে, ইহারা এতই মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা মওলানা আবুল কালামকে চিনিতে পাবে নাই। আজ জামাল উদ্দীন সর্বত্র যে সম্মান পাইতেছেন, উত্তরকালে মওলানা আজাদও তদ্রূপ সম্মান পাইবেন। যে দিক দিঘাই দেখি না কেন, মওলানা আজাদ একজন যুগ প্রবর্তক মনীষী, বিংশ শতাব্দীর “মোজাদ্দেদ”।

বাজনৈতিক জীবনে বহু নেতা বহু ডিগ্‌বাজী থাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রথম জীবনের নীতি ও আদর্শের সহিত শেষ জীবনের নীতি ও আদর্শের কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকে না, তাঁহারা শেষ জীবনে সম্পূর্ণ বিপ্লবীত পন্থা অবলম্বন করেন। মিঃ ব্যাংজে ম্যাকডোনাল্ড প্রথম জীবনে ছিলেন শ্রমিক দলের নেতা, পরে হইয়া পড়িলেন বক্ষণশীল দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সাব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বিপিনচন্দ্র পাল, মিঃ এম, এ জিন্না, শ্রীবাৰীন্দ্র-কুমার ঘোষ, মওলানা মোহাম্মদ আকবর খাঁ প্রমুখ নেতাগণ কোথা হইতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহাব কাবণ কি? ব্যক্তিগত স্বার্থ ইহাব মূল কাবণ নহ। ইহাব মূল কাবণ দূরদর্শিতাব অভাব। তাঁহারা প্রথম জীবনে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কাজ করিয়া অনাগত যুগের বিবার্ট পরিবর্তনের ও যুগান্তকারী বিপ্লবের কথা ভাবিতে পাবেন নাই। তাঁহারা

একটু অগ্রসব হইয়াই মনে কবিয়াছিলেন—উহাই বুঝি প্রগতির চবম বিকাশ ,
 উহা অপেক্ষা আব এক পা অগ্রসব হওয়া চলে না । নিজেদেব পবিকল্পিত
 আদর্শকে তাঁহাবা চবম আদর্শ বলিয়া বিবেচনা কনিয়াছিলেন । অত্ৰ
 কাহাকে আব একটু অগ্রসব হইতে দেখিলে তাঁহাবা ভয়ে অস্থিব হইয়া
 পড়িতেন । এত দিনেব সব সাধনা বুঝি পও হইয়া যাইবে । কিন্তু যাঁহারা
 সত্যিকাবেব বিপ্লবী, তাঁহাবা একপ কবেন না । তাঁহাবা সব সময়েই অনাগত
 যুগেব বিপ্লব, আলোডন ও পবিবর্তনেব কথা ভাবিয়া থাকেন । সেই জন্ত
 তাঁহাবা যেখানে দাঁড়াইয়া কাৰ্য্য আবস্ত কবেন, সেইখানেই স্থিব হইয়া
 থাকেন না । যুগেব প্রযোজনমত প্রগতিব আদর্শ ও সীমা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে
 নিজেবাও সেই তালে তালে অগ্রসব হন । সেই জন্ত তাঁহাবা কোন যুগেই
 সে-কেলে ও বক্ষণশীল হইয়া থাকেন না । প্রাচীনত্বেব দোহাষ দিয়া কোন
 কৰ্ম্মপন্থাকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তাঁহাবা মনে কবেন না । তাঁহাবা
 জানেন যে, বাজনীতিতে অলঙ্ঘ্য ও পবিত্র (Sacrosanct) বলিয়া কোন
 বস্ত্ত নাই । ক্রমবর্দ্ধমান জন-জাগবণেব সহিত বাজনীতিক আদর্শ, অধিকাৰ ও
 কৰ্ম্মপন্থাব সীমা পবিবর্ত্তন হয় । তাই তাঁহাবা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক
 পবিবর্ত্তন ও বিপ্লবেব মধ্যেও অনাগত ভবিষ্যতেব পানে চাহিয়া থাকেন ।
 তাবটা এইকপ, আবও বিপ্লব আসিবে, তাহাও সহ কবিতে হইবে । তাঁহাদেব
 প্রত্যেক কৰ্ম্মপন্থায় ভবিষ্যতেব বিপ্লবেব ইঙ্গিত থাকিয়া যায় । তাঁহাবা চিব
 নবীন ও চিব সজীব । মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই ধবণেব মনীষী,
 এই ধবণেব বিপ্লবী । মুসলমান সমাজ যখন আলিগড় স্কুলেব প্রভাবে পড়িয়া
 প্রগতিমূলক বাজনীতিব কথা চিন্তা কবিত না, তখন তিনি তাহাদেব সম্মুখে

স্বাধীনতার আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন, তাহাঁদেরকে আলিগড়ের বিধাত্ত প্রভাব হইতে মুক্ত কবিত্তে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কবিলেন, মুসলিম লীগকে ভিক্ষাবৃত্তি পবিত্যাগ কবিত্তে উদ্বীপিত কবিলেন। এবং তাঁহাবই প্রভাবে লীগ বাজানুগতোব ধাবা উঠাইয়া দিয়া রাজনৈতিক কক্ষাবাবা গ্রহণ কবিল।

নিকট-প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদেব লীলাখেলা দেখিয়া এবং ভাবতে ভেদনীতিব উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া মঙলানা আজাদ এদেশবাসীকে আন্তর্জাতিক সমস্তাব পট-ভূমিকায় ভাবতেব সমস্তা পাঠ কবিত্তে শিক্ষা দিলেন। খিলাফতেব প্রথ্বে তিনি মুসলমান সমাজকে সংগ্রামেব সম্মুখে লইয়া গেলেন। আইন অমান্য আন্দোলনেব সময় তিনি স্বাধীনতার পতাকা ধাবণ কবিয়া সহাস্রবদনে কাবাববণ কবিলেন। স্বদেশী যুগে বিপ্লবাত্মক বাজনীতিতে যোগ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। আব আজ যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুন দেশেব সর্বত্র প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি মুসলমানকে বিশেষ স্তুবিধা অপেক্ষা পবিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা চিন্তা কবিত্তে উপদেশ দিতেছেন। এই ভাবে সত্যিকাবেব বিপ্লবীব মত তিনি আজ দীর্ঘকাল ধবিয়া সমাজ ও দেশেব সেবা কবিয়াছেন। ধাপে ধাপে প্রগতিব পথে তিনি অগ্রসব হইয়াছেন, কিন্তু কখনও প্রতিক্রিয়াশীল ও বক্ষণশীল দলেব আদর্শ গ্রহণ কবেন নাই। তিনি জীবনে কখনও বাজনৈতিক ডিগ্বাজী খান নাই। সহকর্মীদেব সহিত মতভেদেব কাবণে তিনি কখনও দলাদলি কবেন নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র কবিয়া তিনি কখনও ভূয়া দল গঠন কবেন নাই, বা কোন ভূয়া দলেব সংস্বেও কখনও আসেন নাই। কর্তৃপক্ষেব ভেদনীতিব ফলস্বরূপ

যে সব দল উপদল আজ দেশেব স্বাধীনতাব পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তিনি সেগুলিব সহিত সংশ্রব রাখিতে পাবেন নাই। তিনি মুসলমানের তথা দেশেব সত্যিকাবেব বন্ধু। তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাবই চোখেব সন্মুখে নিকট-প্রাচ্যেব মুসলিম বাষ্ট্রগুলিব উপব সাম্রাজ্যবাদ কিরূপ চক্রান্তজাল বিস্তার কবিয়া তথায় নিজেদেব প্রভাব বিস্তার কবিয়াছে। অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি দেখিলেন, তাবতীয় মুসলমানকে বিভ্রান্ত কবিবার জন্ত সেইকপই ষড়যন্ত্র হইতেছে। চোখেব উপব এত সব উদাহরণ বিদ্যমান থাকিতে মওলানা আজাদ নিজেকে সাম্রাজ্যবাদেব খেলাব পুতুলে পবিত্ত হইতে দেন নাই। তিনি তাই পুনঃ পুনঃ সমাজকে সাবধান কবিয়া দিয়াছেন : “ওপথে মুক্তি নাই, ও পথ ছাড়।”

আজ এই মহা মনীষীৰ ক্ষুদ্র জীবনী বাঙ্গালী পাঠক সমাজেব সন্মুখে উপস্থিত কবিলাম। ইহাব সমস্ত উপাদান শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই প্রণীত “মওলানা আবুল কালাম আজাদ” নামক ইংবাজী গ্রন্থ হইতে গ্রহণ কবিয়াছি। ইহাতে শ্রীযুক্ত দেশাই মহাশয়েব অনুমতি পাইয়াছি, এই জন্ত তাঁহাব নিকট চিব কৃতজ্ঞ। আশা কবি বাঙ্গালী পাঠকগণ ইহাতে মওলানা আজাদেব সত্যিকাবেব পবিচয় পাইবেন। সমাজ যদি এই মনীষীকে চিনিতে পাবে, তবে পবিশ্রম সার্থক হইল মনে কবিব। ইতি

মনীষী

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

সূচনা

মওলানা আবুল কালাম আজাদ বখন বামগড় কংগ্রেসেব জ্ঞাত সভাপতি নির্বাচিত হন (মার্চ মাস, ১৯৪০), তখন তিনি ভোট পাইয়াছিলেন ১৮৫৪টি, আব তাঁহাব প্রতিদ্বন্দী ভোট পান মাত্র ১৮৩টি । ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয় নহে । সেবাব তিনিই যে সভাপতি নির্বাচিত হইবেম ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া লোকে জানিত । অনেকে এই নির্বাচন হইতে ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস মুসলমানের শত্রু নহে, ববং মুসলমানের স্বার্থেব জ্ঞাতও সংগ্রাম কবিয়া থাকে । মুসলমান-সমাজ কংগ্রেস পবিত্যাগ কবে নাই, তাহাদেব একটা বৃহৎ অংশ কংগ্রেসেব ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছে । আবাব অনেকে মনে কবেন, যে সব মুসলমান দাবী কবেন যে, লীগই মুসলমান সমাজেব একমাত্র প্রতিষ্ঠান, মওলানা আজাদ সাহেবেব নির্বাচন

তাহাদেবকে মুখের উপর জবাব দিয়া ঘোষণা কবিতোছে যে, লীগের উক্ত প্রকাব দাবী সত্য নহে। এসব কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এ নির্বাচনের সহিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন সংশ্রব নাই। মওলানা আজাদ সাহেব ইহাব বহু পূর্বেই একবার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাব পবেও আবও ছ'একবার হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় সে সম্মান পাবত্যাগ কবিয়াছিলেন। তাহাব ব্যক্তিত্ব, তাহাব ত্যাগ, মনীষা ও অসামান্য প্রতিভাই তাহাকে সভাপতি নির্বাচিত কবিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে ইহাব সহিত জড়িত করা উচিত নহে। একজন মুসলমানের পক্ষে সভাপতি নির্বাচিত হওয়া কংগ্রেসের ইতিহাসে কোন নূতন ঘটনা নহে। গান্ধী-প্রভাবের পূর্বে বহু প্রথিতযশা মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন—যেমন হইয়াছেন খুশান ও পার্শী, এবং গান্ধী-প্রভাবের পবেও চারিজন মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে মওলানা আজাদ নিজেই একজন (১৯২৩ সালে)। তখন তাহাব বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর ছিল। স্মৃতবাং ১৯৪০ সালে মওলানা আজাদ সাহেবের সভাপতি নির্বাচিত হওয়াব যদি কোন তাৎপর্য থাকে, তবে তাহা এই যে, কংগ্রেস ভাবতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাহাব গোববান্বিত পদে অধিষ্ঠিত কবিতো কখনও কাতব হয় নাই। যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন বিবেচনাব দ্বারা কংগ্রেস পরিচালিত হয় না।

ইউরোপ মওলানা আজাদকে ভাল কবিয়া জানে না। কিন্তু ভাবতবর্ষ তাহাব প্রথম সেবককে বেশ ভাল কবিয়াই জানে। গান্ধীজীব নাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশের বহু পূর্বে এই মওলানা “বিদ্রোহী” বলিয়া সখ্যাতি

অৰ্জুন কবিয়াছিলেন। বিগত প্রথম মহাসমবেদ সময় গান্ধীজী ব্রিটিশ সবকাবের সহিত সহযোগিতা কবিয়াছিলেন। তিনি স্বচ্ছায় ব্রিটিশের প্রতি আত্মগত্যা ঘোষণা কবিয়াছিলেন। কিন্তু মওলানা আজাদ সেই সময় নিজেকে “বিদ্রোহী” বলিয়া ঘোষণা কবিয়াছিলেন এবং সেই অপবাধে ভাবত সবকাবের আদেশে গ্রেপ্তার হইয়া কয়েক বৎসর অন্তর্বীণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা একটা অদ্ভুত ঘটনা যে, কংগ্রেস যখন বর্তমান সমবে অসহযোগিতা কবিতোছে, সেই সময় ভাবতমাতাব এমন একজন কৃতী সন্তান তাহাব বর্ণনাব হইয়াছেন, যিনি দুই যুগ পূর্বে ঠিক একই পরিস্থিতির মধ্যে ব্রিটেন যখন আব একটা বিশ্বসনব পবিচালন কবিয়াছিল, তখন তাব্রভাবে তাহাব কায্যের সমালোচনা কবিয়াছিলেন এবং তাহাব সহিত সহযোগিতা কবিতো বিবত হইয়াছিলেন। সে যুগে তাহাব প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত “আল-হেলাল” দেশময় এমন একটা প্রভাব বিস্তার কবিতো সক্ষম হইয়াছিল এবং সবকাবী পলিমিব এমন নির্ভীক সমালোচনা কবিয়াছিল যে, সবকাব প্রথমে ইহাব জামিন বাজেয়াপ্ত কবিলেন এবং পরে মওলানাকেও অন্তর্বীণে আবদ্ধ কবিলেন।

এই অন্তর্বীণ তাহাকে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী কবিল না—তিনি ইহাব তীব্র সমালোচক হইয়া উঠিলেন। ১৯২০ সালে যখন তিনি মুক্তি পাইলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, স্বদেশের বহু লোকের ভ্রম দূর হইয়াছে। তাহাব সবকাবের প্রতি আত্মগত্যা পবিত্যাগ কবিয়াছে। ইহাবই জন্য তিনি দীর্ঘ দিন সাধনা কবিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহাব সুদীর্ঘকাল পোষিত স্বপ্ন এতদিনে বুঝি সত্যে পবিণত হইতে চলিয়াছে।

ইহার পূর্বে তিনি এই দিনেব আগমনী বাণী, শুনাইবাব জন্ত গভীর গর্জনে সাবা ভাবত প্রকম্পিত কবিয়াছিলেন। আজ দেখিলেন, তাঁহাব সে গর্জন ব্যর্থ হয় নাই। তিনি আবার মুসলমান সমাজকে বলিলেন : “তোমরা যে পথে যাইতেছ, সেখান হইতে সবিধা আইস। তোমরা ভাল কবিয়া অনুগমন কব যে, এদেশেব হিন্দুদেব মত তোমরাও একই জন্মভূমিৰ সন্তান। একই সমুদ্রে দুই সম্প্রদায়কে সাঁতার কাটিয়া তীবে উঠিতে হইবে। অথবা একই সঙ্গে তোমাদিগকে অকূল পাথাবে ডুবিতে হইবে।” কাবাগাব হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি দেখিলেন যে, নানাদিকেব প্রতাবেব চাপে ঘটনা এমনভাবে গিয়াছে যে, হিন্দু মুসলমান আজ ভাল কবিয়া বুঝিয়াছে যে, তাহাদিগকে এক হইতেই হইবে, একই সঙ্গে বসবাস কবিতে হইবে, একই সঙ্গে সকল কাজ কবিতে হইবে এবং একই সঙ্গে তাহাব ফল ভোগও কবিতে হইবে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি মনে বড়ই আনন্দ পাইলেন। ইহাব পব হইতে তিনি হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, শিখ, খৃষ্টান—ইহাদেব সকলেব সঙ্গে আপনাব ভাগ্যকে জড়াইয়া ফেলিলেন। সাম্প্রদায়িকতাব উগ্রতম বিকাশও তাহাকে এই আদর্শ হইতে একপদও স্থলিত কবিতে পাবে নাই। বামগণ্ডেব সভাপতিব আসন হইতে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কবেন,—“আমি ১৯১২ সালে মুসলমান সম্প্রদায়কে যে ‘ইশুব’ উপর দাঁড়াইয়া সম্বোধন কবিয়াছিলাম, আজিও ঠিক সেই ‘ইশুব’ উপর দাঁড়াইয়া আছি। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, আমি সে সবই চিন্তা কবিয়াছি। আগাব চক্ষু তাহা দেখিয়াছে এবং আমি মনে মনে তাহা বিবেচনা কবিয়াছি। এই সব ঘটনাকে আমি নিষ্ক্রিয় দর্শকেব মত

দেখি নাই, আমি সর্বক্ষণই উহাদের মধ্যে ছিলাম, উহাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছি, যত্নসহকায়ে প্রত্যেকটি ঘটনা পরীক্ষা করিয়াছি। আমি যাহা দেখিয়াছি ও লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না, আমার বিশ্বাসেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারি না। আমার বিবেকের বাণীকে দাবাইতে পারি না। সমগ্র যুগ ধরিয়া আমি যাহা বলিয়াছি, আজ আমি তাহাবই পুনরাবৃত্তি করিব এবং বলিব যে, ১৯১২ সালে তাহাদের জন্ত যে পথের নির্দেশ দিয়াছিলাম, আজিও ভাবতের নয় কোটি মুসলমানের সেই পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই।” দেশে সাম্প্রদায়িক বিবাদ নানা বীভৎস মূর্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্বে যাহাবা বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন, তাহাদের অনেকে পরস্পরের শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ কেহ বিভিন্ন দলে চলিয়া গিয়াছেন এবং একে অপরের গালাগালি দেওয়া-কেই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। সময়ের গতিব সহিত বন্ধুত্বাপন্ন দুই সম্প্রদায় আজ কলহ-বিবাদে বত। কিন্তু এই পরিবর্তন ও দল ভাঙ্গাতাস্ত্রির মধ্যে যওয়ানান আঙ্গাদ আজিও স্বদৃঢ় পর্বতের মত অটল ও অপরিবর্তনীয় হইয়া বাহিয়াছেন। তাহাব সাবধান-বাণী নিষ্ফল হয় নাই। তাহাব ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ব্যর্থ হয় নাই। আজ যদি সমগ্র মুসলমান সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ কবে, তাহাকে কুৎসিতভাবে নিন্দা কবে, তবুও তিনি নিজের আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া বহিবেন। তিনি একাকী দাঁড়াইয়া সমাজের অন্ধমানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবেন। হিন্দু-মুসলমানের একতায় তাহাব অগাধ বিশ্বাস। তাহাদের জন্ত একই গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে তাহাব বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়

হইয়াছে। তাহাব আদর্শেব এই দিবটাই তাঁহাকে দেশেব কোটি কোটি লোকেব নিকট প্রিয় কবিয়া তুলিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশেব বহু পণ্ডিত সাব সৈয়দ আহমদ খানেব জীবনচরিত ভাল কবিয়া জানেন। তাহাবা তাঁহাব বিষয় আলোচনা কবেন। কিন্তু মওলানা আজাদ সাহেব সাব সৈয়দ আহমদ অপেক্ষা অধিক মনীষাসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। তাঁহাব শক্তি ও দৃঢ়তাও অপার। অথচ এই মহৎ ব্যক্তিৰ বিষয় ইংলণ্ড ভাল কবিয়া জানিতে চাহে না। ইহাব কারণও আছে। একথা সত্য যে, সাব সৈয়দ আহমদ মুসলিম মানসিকতাৰ মধ্যে একটা অপূৰ্ব বিপ্লব আনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ জাতিৰ প্রতি একপ অশ্রুবক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভাবতে ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতাব আশীৰ্বাদ বলিয়া মনে কবিতেন। আব সেই জন্তই তিনি ছিলেন ইহাব প্রচণ্ড সমর্থক। কিন্তু মওলানা আজাদ একটু স্বতন্ত্র ধৰণেব লোক। বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানিৰ সহিত তাঁহাব তুলনা হইতে পারে। বস্তুতঃ, জামালুদ্দিনেব পৰ এত বড় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সমগ্র মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ কবেন নাই। মওলানা আজাদ সাহেব জামালুদ্দিনেব মতই প্রথম হইতে বিদেশী শাসনেব বিবোধী ছিলেন। প্রায় পঁচিশ বৎসৰ ধৰিয়া তিনি একাকী সংগ্রাম কবিয়াছিলেন। জামালুদ্দিনেব মত সরকারী দলিলপত্রে তিনি ‘বিদ্রোহী’ (Rebel) বলিয়া কথিত আছেন। পার্থক্য এইখানে যে, জামালুদ্দিন সহিংস ‘বিদ্রোহী’, আব মওলানা আজাদ ‘অহিংস বিদ্রোহী’। তিনি আজীবন স্বাধীনতাৰ জন্ত সংগ্রাম কবিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইংবেজ জাতিৰ বিৰুদ্ধে ঘণাব ভাব পোষণ কবেন না।

এই দেশজোড়া সাম্প্রদায়িকতার যুগে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহৰুৰ মত মণ্ডলানা আবুল কালাম আজাদ সৰ্ব্বপ্ৰকাৰ ক্ষুদ্ৰতা ও দীনতাব উৰ্দ্ধে থাকিয়া দেশবাসীৰ সন্মুখে স্বাধীনতা ও একতাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিয়া আঁসিতেছেন। স্মৃতবাং তাঁহাৰ কৰ্মজীবনেৰ সহিত প্ৰত্যেক ভাৰতবাসীৰ পৰিচয় থাকা দৰকাৰ। তাহা হতাশাৰ মধ্য আশাৰ আলো সঞ্চাৰ কৰিবে।

জন্ম, বংশপরিচয় ও বাল্যজীবন

মওলানা আজাদেব পূর্বপুরুষগণ বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান ও সূক্ষ্ম মনোভাবের জন্ত সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তিনি এমন একজন মহাপুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, যিনি সম্রাট আকবরের সময় পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হজরত শেখ জামালুদ্দিন। তিনি নিজে ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সূফী। সংসারের প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি ছিল না। কেবল ধ্যান, ধারণা ও ধর্মপ্রচার করিয়া জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার রচিত কতকগুলি গ্রন্থ এখনও উচ্চ প্রশংসা পাইয়া থাকে। তাঁহার রচিত হাদিসের ভাষা আজিও একখানি দলিলপূর্ণ পুস্তক বলিয়া পণ্ডিত সমাজে আদৃত। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। আকবরের ভ্রাতা খানে আজম তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে ধর্মশিক্ষার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষের পদ দিয়া তাঁহাকে রাজসম্মানে বিভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাছাড়া জায়গীর ও মাসিক ভাতা বাবদে বহু ধনসম্পদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সূফী জামালুদ্দিন রাজ্যের এই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। রাজাকে দৃষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন, দাবিদ্র্যই আমার ভ্রষণ—রাজ্যের দান গ্রহণ করিয়া আমি আমার আত্মাকে কলুষিত করিব না। তৎপরে তাঁহার জীবনে এমন এক সময় আসিল, যখন তাঁহাকে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল এবং সেইজন্য তিনি আকবরের বিবাহভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তবুও দিনেকের তরে সম্রাটের নিকট মাথা

নত কবেন নাই। ঘটনাটি এইরূপ :—একবার আকবরের বিখ্যাত সভাসদ আবুল ফজল প্রস্তাব কবেন যে, সম্রাট আকবর কেবল পাখি বিষয়ের নেতা নহেন, তিনি আধ্যাত্মিক জীবনেরও নেতা। এই আদর্শ দেশের প্রত্যেককে গ্রহণ কবিতে হইবে। ওলামা বা একবাকো ইহা স্বীকার কবিতে পাবিলেন না, আবার সবাসবি বাতিল কবিতেও পাবিলেন না। তাঁহা বা একটা নতুন চাল চাপিলেন। আবুল ফজলের পিতা মোল্লা মোবাবকে প্রস্তাবক্রমে একটা ফতোয়া লিখিত হইল। তাহা ব মধ্য এইরূপ :—যেহেতু বাজা সুবিচারক ও সুশাসক, সেই হেতু তিনি একজন ‘মুজাদ্দের’ (সংস্কারক)। সুতরাং তিনি ধর্মের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য অথবাটি।

মোল্লা মোবাবক সর্বপ্রথমে এই ফতোয়া স্বাক্ষর কবিলেন ও অন্যান্য ওলামাদেরকে স্বাক্ষর কবিতে বলিলেন। আগ্রা, জৌনপুর ও আবও কয়েকটি স্থানের ওলামাগণ ইহাতে স্বাক্ষর কবিলেন। তাবপব দিল্লীর ওলামাগণকে স্বাক্ষর কবিতে বলা হইল। কিন্তু শেখ জামালুদ্দিন তাহা স্বাক্ষর কবিতে অস্বীকার কবিলেন, এবং দৃঢ়ভাবে বলিলেন, আমি একপভাবে বাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহা ব দেখাদেখি আবও দুচাবজন ওলামা স্বাক্ষর কবিলেন না। ইহা ব পব তাঁহা ব উপর রাজবোধ পতিত হইল। তিনি ভাবতবর্ষ পবিত্যাগ কবিয়া মক্কা চলিয়া গেলেন। মওলানা আজাদ এই মহাপুরুষের একাদশ অধস্তন বংশধর। তাঁহা ব পবিবাবের অনেকেই পণ্ডিত ও সুফী-মতবাদেব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহা বা কখনও সবকাবী চাকবী গ্রহণ করেন নাই, অথবা বাজকীয় অনুগ্রহ-ভিখাবী হন নাই। মওলানা আজাদ সাহেবেব

আব একজন পূৰ্বপুৰুষ সন্ন্যাসী জাহাঙ্গীৰেৰ সমধৰ প্ৰতিষ্ঠালাভ কৰেন। তাঁহাৰ নাম শেখ মহম্মদ। সে যুগে কেহ কেহ সন্ন্যাসীৰ দৰবাৰে হাজিৰ হৈবাব সময় শিব নত কৰিয়া কুনিশ কবিত। বহু ওলামা তাহা কবিত্তে বাধ্য হইতেন। কিন্তু মওলানা আজাদ সাহেবেৰ পূৰ্বপুৰুষ শেখ মহম্মদ তাহাতে সন্মত হন নাই। তিনি এই প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিয়া বলিলেন যে, এই প্ৰকাৰ কুনিশ কেবল গোদাতালাৰ প্ৰাপ্য। কোন মানুষ বা বাজা তাহা পাইতে পাবে না। সন্ন্যাসী জাহাঙ্গীৰ তাঁহাৰ তেজস্বিত। মহু কবিত্তে পাবিলেন না। তাঁহাকে এই জন্তু চাৰি বংশৰ গোয়ালিষাবেৰ জেলে বন্দী কৰিয়া বাধ্য হইয়াছিল।

মওলানা আজাদ সাহেব পূৰ্বপুৰুষ হইতেই বিপ্লবী ভাব উত্তৰাবিকাৰ-সূত্ৰে পাইয়াছিলেন। বহু যুগ ধৰিয়া এই প্ৰকাৰ গৌৰবান্বিত আদৰ্শৰ উপৰ মওলানা আজাদেৰ পৰিবাবৰ্গ দাঁড়াইয়া আছেন। মওলানাৰ পূৰ্বপুৰুষগণ কখনও সৰকাৰী চাকৰী গ্ৰহণ কৰেন নাই। তৰে তাঁহাৰ প্ৰপিতামহ শেখ সিৰাজুদ্দিন এই নীতি প্ৰথম ভঙ্গ কৰেন। তিনি তদানীন্তন মৰকাবেৰ অধীনে প্ৰধান বিচাৰপতি পদে বৰিত হইয়াছিলেন। তাঁহাৰ পৰে আবও অনেকে চাকৰী গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেন। মওলানাৰ পিতামহ একটা চাকৰী গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাৰ পৰ আব কেহ চাকৰী কৰেন নাই। গৌৰবান্বিত পূৰ্বপুৰুষ এ প্ৰাচীন অভিজাত বংশে জন্মলাভ কৰাব যে গৰ্ব ও শ্লাঘা থকা সম্ভব, তাহা আমাদেৰ মওলানাৰ আছে। তাঁহাৰ ধৰ্মনীতে একই বক্ত প্ৰবাহিত। তিনি একদিকে পূৰ্বপুৰুষগণেৰ বহু লোককে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বিচক্ষণ বুদ্ধি, অনন্তসাধাৰণ প্ৰতিভা ও সূমাজিত শিক্ষালাভ কৰিয়াও তিনি কখনও

গুৰুগিৰি কবেন নাই, অথবা শিষ্য সংগ্রহ কবেন নাই। কিন্তু তাঁহাব পিতা ও পূৰ্ব্বপুৰুষগণ অগণ্য শিষ্যেৰ গুৰু ছিলেন। মওলানাব এমন একটা সংঘত ভাব আছে, বুদ্ধিদীপ্ত প্ৰতিভাব এমন একটা বলক আছে যাহাব জন্তু তিনি সকলেৰ সঙ্গ মিশিতে পাবেন না। অনেকেৰ নিকট ইহা অহঙ্কাৰ বলিয়া মনে হইতে পাবে, কিন্তু তিনি অহঙ্কাৰী নহেন, বিনয় তাঁহাব যথেষ্ট আছে। তিনি সাধাৰণতঃ নিৰ্জনে আপনাব গ্ৰন্থ ও সাধনা লইয়া সময় কাটাইয়া থাকেন। তিনি নিজেই তাঁহাব শিষ্য ও ছাত্ৰ—আব ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট।

মওলানা আজাদ সাহেবেৰ পিতা মওলানা খায়কদ্দিন স্বীয় জীৱনে পূৰ্ব্বপুৰুষ জামালুদ্দিনেৰ প্ৰাচীন আদৰ্শ বক্ষা কৰিয়া চলিতেন। তাঁহাবই মত তিনি একাধাৰে পণ্ডিত ও সুদী ছিলেন। তিনি আববী ও দাৰ্বশী ভাষাব বহু মূল্যবান গ্ৰন্থ বচনা কৰিয়াছিলেন। তাঁহাব জীৱন ও কৰ্মনীতি আধ্যাত্ম-চিন্তায় কাটিত। সবল ও সহজভাবে সূফীদেব মতই তিনি জীৱন যাপন কৰিতেন। তাঁহাব সহস্ৰ সহস্ৰ শিষ্য ছিল। দিল্লী, গুজৰাট, কাটিয়াব, বোম্বাই এবং কলিকাতায় তাঁহাব অগণ্য প্ৰভাব ছিল। তিনি অনায়াসে দিল্লীতে শিষ্য ও সাধনা লইয়া সূফী-জীৱন যাপন কৰিতে পাবিতেন এবং পূৰ্ব্ব-পুৰুষগণেৰ মহৎ বৃত্তি অনুসৰণ কৰিয়া চলিতে পাবিতেন। কিন্তু এই সজ্জন ও মহৎ ব্যক্তি সিপাহী বিপ্লবেৰ দুৰ্যোগপূৰ্ণ দিনে নিৰুপদ্রবভাবে থাকিতে পাবিলেন না। ১৮৫৭ সালেৰ সিপাহী বিপ্লবেৰ ফলে দিল্লীতে অত্যাচাৰ ও অনাচাৰেৰ কালছায়া বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিপ্লবীদেবকে দমন কৰিবাব জন্তু কোম্পানীৰ সৈন্যগণ সৰ্বত্ৰ অত্যাচাৰ কৰিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা-নিৰ্বিশেষে সৰ্বত্ৰ তাহাবা অত্যাচাৰ ও হত্যালীলাৰ তাণ্ডব

নৃত্য আবন্ত কবিল। হযত মওলানা খাযকদ্দিন ইহাদেব কবলে পডিয়া অকালে প্রাণ হাবাইতেন। কিন্তু তাঁহাব এক অকৃত্রিম বন্ধুব সাহায্যে তিনি ভাবত পরিত্যাগ কবিয়া পবিত্র মক্কা নগবীতে আশ্রয় লইয়া বক্ষা পাইলেন। সে যুগে ইসলাম জগতেব খলিফা ছিলেন সুলতান আবদুল মজিদ। খলিফা পূর্ব হইতে মওলানা খাযকদ্দিনেব বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্ম সাধনার পবিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বনস্টাণ্টিনোপলে নিমন্ত্রণ কবিয়া পাঠাইলেন। এই সময় তাঁহাব অনেক গ্রন্থ কাযবোতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সেখানে খলিফার দববাবে বেশী দিন থাকিলেন না, অবিলম্বে মক্কায প্রত্যাগমন কবিলেন। সেই সময় মক্কাব সুপ্রসিদ্ধ ‘নহ্বে-জোবেয়দা’ (জোবেয়দাব খাল) সংস্কাব অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পডিয়াছিল। মওলানা খাযকদ্দিন সাহেব তাহা সংস্কাবেব জন্ম কয়েক লক্ষ টাকা তুলিয়া দিলেন। মক্কাতে অবস্থিতিকালে তথাকাব বিখ্যাত পণ্ডিত শেখ মহম্মদ জহিব ইত্বীব বিদূষী বন্ধার সহিত তাঁহাব বিবাহ হয়। ইহাবই গর্ভে আবুল কালাম আজাদ জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা ও মাতা উভযদিক হইতে তিনি যেন উত্তবাধিকাবসূত্রে পাণ্ডিত্য ও মনীষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহাব কিছুদিন পব ভাবতবর্ষ হইতে বহু শিষ্য মক্কাধামে হজ কবিতে গিয়া মওলানাব পিতাকে স্বদেশে চলিয়া আসিতে অনুবোধ কবিলেন। তাহাদেব অনুবোধ উপেক্ষা কবিতে না পাবিয়া তিনি ১৮৮০ সালে ভাবতবর্ষে ফিবিয়া আসিলেন। কিন্তু মক্কাব সহিত সংশ্রব একেবাবে বিচ্ছিন্ন কবেন নাই। ১৮৮০ হইতে ১৮৯২ এব মধ্যে তিনি কয়েকবারই মক্কা গিয়াছিলেন। এই সময় ১৮৮৮ সালে মওলানা আবুল কালাম মক্কা নগবীতে জন্মগ্রহণ কবেন।

বাল্যাবস্থায় মওলানা আবুল কালাম আবব দেশেই কাটাইয়াছিলেন এবং সেইখানেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ কৰিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি পিতাব সহিত কলিকাতা আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাস কৰিতে লাগিলেন। আবব-মাতাব নিকট পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া বাল্যাবস্থায় আববীই ছিল তাঁহাব মাতৃভাষা। তাঁহাব মাতা অন্য কোন ভাষা জানিতেন না। পবে তিনি পিতাব নিকট উৰ্দু ও ফাৰসী শিখিয়াছিলেন। কলিকাতা আসিবাব সময় এই তিন ভাষা তিনি আয়ত্ত কৰিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাকে কোন স্কুল বা মাদ্রাসায় পাঠান হয় নাই। পিতাব নিকট ও পিতাব বন্ধু স্থানীয় আলেম-গণেব নিকট তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পাঠে তাহাব উন্নতি অসম্ভবৰূপে হইয়াছিল। “দাব্‌সে নেজামিয়া” হইতেছে মাদ্রাসা শিক্ষাব একটা পৰিপূৰ্ণ পাঠ। আববী ফাৰসী, ভাষাতত্ত্ব, দৰ্শন, তৰ্কশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল ও ইতিহাস—এই কয়েকটি বিষয় এই পাঠ-ব্যবস্থাব অন্তৰ্গত। সাধাৰণ ছাত্র চৌদ্দ ও পনব বৎসবেব কম সময়ে ইহা শেষ কৰিতে পাবে না। আব যাহাবা মেধাবী তাহাবা দশ বৎসবে ইহা সমাপ্ত কবে। আবুল কালামেব প্রতিভা কত তীক্ষ্ণ ছিল তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে যে, এই বৰ্ণেব কঠিন পাঠ তিনি মাত্র চাবি বৎসবে শেষ কবেন। অবশ্য পাঠ লইবাব পূৰ্বে আববী ও ফাৰসীতে তাঁহাব ভিত্তি সূদৃঢ় হইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি অপৰকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিক্ষকতা কৰাও উক্ত ‘দাব্‌সে নেজামিয়াব’ অন্তৰ্গত ছিল। ছাত্রগণ যাবৎ পঠিত বিষয় অন্য ছাত্রকে সূচাকৰূপে পডাইতে না পাবিত, তাবৎ তাহাদিগকে ‘আলিম’ বলা হইত না, অথবা ‘দাব্‌সে

নেজোমিয়ায়' সনদ দেওয়া হইত না। বালক আবুল কালাম চৌদ্দ বৎসর বয়সে ছাত্র-শিক্ষক হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এই বয়সে বক্তৃতাগুলি ছাত্রকে পাঠ দিতে হইত এবং বিষয়টি বুঝাইতে হইত। তবেই তিনি সনদ পাইয়াছিলেন। এই সব উপছাত্রদের মধ্যে একটি পবিত্র বয়সের ছাত্র তাহার নিকট পাঠ লইত। সে ছিল জাতিতে পাঠান। তাহার প্রণয়িত শ্রুতি, দীর্ঘ দেহ দেখিয়া মনে হইত সে না জানি কতই পণ্ডিত। কিন্তু বুদ্ধি ছিল তাহার একটু মোটা ধবণের। তাহাকে পড়াইবার ভার পড়িল আবুল কালামের উপর। তাহার মোটা বুদ্ধি দেখিয়া মাঝে মাঝে মওলানার বৈয়াক্যুতি ঘটত। দিনের পর দিন তিনি তাহাকে 'কেদাম' (deductive), ও 'ইস্‌তাক্বা' (inductive) বুদ্ধিবাব পার্থক্য বুঝাইয়া চলিতেন। কিন্তু সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। একদিন বৈয়াক্বা হাবাইয়া আবুল কালাম তাহার মুখে উপর পুস্তকখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ক্রোধভরে বলিলেন, "তোমার কিছুই হইবে না, তুমি ঘাস খাওগে।" পাঠান কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং সাবাদিন কিছুই আহাণ কবিল না। তাহার পিতা এই ঘটনা জানিতে পারিয়া আবুল কালামকে ভৎসনা কবিলেন এবং বলিলেন, এ লোকটি তোমার পিতার বয়সের, কেন তুমি তাহার প্রতি এই প্রকার দুর্ব্যবহার কবিলে? যাও তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লও এবং তাহাকে খাটতে অনুবোধ কর।" কিন্তু পাঠানটি এমন ব্যবহার কবিল যেন মনে হইল কিছুই হয় নাই। সে আবুল কালামকে বলিল, "আপনি হইতেছেন আমার গুরু, আব আমি আপনার শিষ্য, আমাকে দণ্ড দিবার অধিকার আপনার আছে। আমার

নিকট ক্ষমা চাহিবার কোন কাৰণ নাই।” তাহাৰ এই ব্যবহাৰে আবুল কালাম আবও লজ্জিত হইলেন এবং তিনি তাহাকে না খাওঁইয়া ছাড়িলেন না।

তিনি কিছুদিন ধৰিয়া পিতাৰ নিকট থাকিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ কৰিষাছিলেন। তাহাৰ স্বভাৱ, চৰিত্ৰ, বংশস্বৰ্ণন ভৱিষ্যৎ, নম্ৰতা ও আচাৰ-ব্যবহাৰ সবই তিনি পিতাৰ নিকট লাভ কৰেন। বাল্যকালই চৰিত্ৰ গঠনেৰ সময়। আৰু এই বাল্যকালে তাহাৰ প্ৰধান সঙ্গী ও শিক্ষক ছিলেন তাহাৰ পিতা। তাহাৰ পিতা একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন। তাহাৰ হাজাৰ হাজাৰ শিষ্য তাহাকে দেগিতে আসিত। কিন্তু তিনি নিৰ্জ্ঞানতা ভালবাসিতেন বৰিষা বৈশীক্ষণ কাহাবও সহিত গোণগল্প কৰিতেন না এবং সহজে কাহাবও নিমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰিতেন না, বা কাহাবও বাটী যাইতেন না। তবে “মিলাদ শবোকে”ৰ নিমন্ত্ৰণ প্ৰত্যাখ্যান কৰিতেন না এবং ঈদেৰ দিনে দুচাবজন অন্তৰঙ্গ শিষ্যেৰ বাটী যাইতেন। তাহাৰ গৃহে প্ৰত্যেক বিষয়ে চৰমতম সৰলতা ও আডম্বৰহীনতা সততঃ বিৰাজমান থাকিত। নবযুগেৰ প্ৰভাবে তিনি কখনও আক্ৰান্ত হন নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ প্ৰতি তিনি ঘৃণাৰ ভাৱ পোষণ কৰিতেন। অথচ তাহাৰ মনো কোনওকণ ধৰ্ম্মান্বিতা ছিল না। গৃহে দামাত্ৰ ধৰণেৰ আসবাবপত্ৰ থাকিত। মেৰোতে মাজুৰ পাতা থাকিত, তাহাবই উপৰ ধনী-দৰিদ্ৰ, উচ্চ নীচ, নিমন্ত্ৰিত ও অভাগত ব্যক্তিগণ উপবেশন কৰিতেন। আগন্তুকদেৰ মধ্যে বড় বড় নবাব, ৰাজাও ছিলেন। টিপু স্বৰ্ণতানেৰ পুত্ৰ মাৰো মাৰো তাহাৰ নিকট আসিতেন। তাহাৰ পোষাক-পৰিচ্ছদ অতি সাদাসিধে ধৰণেৰ ছিন। তিনি বোতামওয়ানা কোট কখনও

পরিধান কবেন নাই। পুত্র আবুল কালামকে তিনি এইভাবে মানুষ কবিয়াছিলেন। আব সেই জন্ম তিনি তাঁহাকে কোনও ইংরেজি স্কুলে পড়িতে দেন নাই। গৃহে ‘দাবসে নেজামিয়ার’ পাঠ শেষ কবাইয়া তিনি আবুল কালামকে ১৯০৫ সালে আলেম হইবার জন্ম মিশবেব আল আজহাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কবেন। সেখানে দুই বৎসর পড়িয়া ১৯০৭ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন। মিশবে অবস্থিতিকালে তিনি বহু বিপ্লবী নেতাব সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। মুসলিম জগতের উপর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ কি ভাবে প্রভাব বিস্তার কবিতেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই জন্ম ভারতে আসিয়া অন্যান্য মুসলিম নেতাদের সহিত একমত হইতে পাবেন নাই। তাঁহার ভারত প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯০৯ সালে তাঁহার পিতা কলিকাতায় পরলোকগমন কবেন। তাহার পর তিনি স্বাধীনভাবে জ্ঞানালোচনা কবিতেন লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক বন্ধুর উৎসাহে ইংবেজি পড়িতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায়ক হইল একখানি ব্যাকরণ ও অভিধান। এইভাবে তিনি অল্প দিনের মধ্যে ইংবেজি ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পিতাব বহু হিন্দু শিষ্য ছিল। তাঁহারা তাঁহাকে ধর্মবিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতেন। আর তিনি জলের মত সে সবের উত্তর দিয়া ঘাইতেন। এমন পিতাব স্মরণ্য পুত্র যে আজীবন হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীৰ জন্ম চেষ্টা কবিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

প্রতিভার উন্মেষ

মওলানা আজাদ অসীম প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ কৰিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও দিন প্রতিভাৰ অপপ্রয়োগ কৰেন নাই। দেশ, জাতি ও সমাজেৰ কল্যাণেৰ জন্তু তিনি তাঁহাৰ সমগ্ৰ জীৱন উৎসৰ্গ কৰিলেন। তিনি কোন দিন সখেৰ বাজনোতি কৰেন নাই। প্ৰথম হইতে আজ পৰ্য্যন্ত একটা আদৰ্শকে কেন্দ্ৰ কৰিয়া তাঁহাৰ অপূৰ্ব্ব প্রতিভা ও শক্তি বিকশিত হইয়াছে। তাঁহাৰ পিতা একজন স্বনামধন্য ‘পীৰ’ (দীক্ষাগুৰু) ছিলেন। পিতাৰ চৰণতলে বসিয়া তিনি তাঁহাৰই পদাঙ্ক অনুসৰণ কৰিয়া পৌৰোহিত্য বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিতে পাৰিতেন। প্রতিভা ও ত্যাগেৰ বলে তিনি পিতাৰ গ্ৰাঘ গণ্যমান্য ‘পীৰ’ হইতে পাৰিতেন। এ পথ তাঁহাৰ জন্তু মুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি সে দিকে গেলেন না। তাঁহাৰ জ্ঞানগৰিমা, শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজেৰ জন্তু বেদনাবোধ এত প্ৰবল ছিল যে, তিনি ‘পীৰেৰ’ জীৱনকে তাঁহাৰ আদৰ্শ সিদ্ধিৰ পথে সহায়ক বলিয়া মনে কৰিলেন না। এ পৌৰোহিত্য-জীৱনে তিনি সন্তোষলাভ কৰিলেন না। দেশেৰ ও সমাজেৰ কল্যাণেৰ উদ্দেশ্যে অগ্ৰ পথ বাছিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, ভাৰতেৰ মুসলিম স্বধিগণ বহিৰ্জগতেৰ বিশেষতঃ নিকট-প্ৰাচ্যেৰ মুসলিম বাহুঁৰে কোন সংবাদ বাখেন না, বা বাখিতে চাহেন না। তাঁহাৰ প্ৰথম কাজ হইল বহিৰ্জগতেৰ সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপন কৰা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি এই ধৰণেৰ নানা গ্ৰন্থ ও সাময়িক পত্ৰিকা সংগ্ৰহ কৰিয়া দিনেৰ পৰ দিন কাটাইয়া দিলেন। তখন যে সব বিষয়

বহির্জগতে আলোচিত হইয়াছিল, নিকট-প্রাচ্যেৰ উপৰ ইউৰোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যে সব ষড়যন্ত্ৰ জাল বিস্তাৰ কৰিতেছিল, তৎসমুদয় সম্যকৰূপে অবগত হইলেন। লিখিবাব প্ৰবৃত্তি তাঁহাব শৈশব হইতেই ছিল। এক্ষণে লেখনীৰ সাহায্যে তিনি তাঁহাব অভিজ্ঞতালব্ধ তাবধাবা প্ৰচাৰ কৰিতে মনস্থ কৰিলেন। বাল্যকালেই তিনি কতকগুলি সাময়িকপত্ৰে বহু প্ৰবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং কয়েকটি ছোট ছোট পত্ৰিকাৰ সম্পাদকতা কৰিয়াছিলেন। স্বাধীনভাবে নিজৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰিবাব জন্তু তিনি “লিসানুল-সিদ্ক” নাম দিয়া একটি পত্ৰিকা প্ৰকাশ কৰিলেন। তখন তাঁহাব বয়স মাত্ৰ চৌদ্দ বৎসৰ। এই অল্প বয়সে কোন বিষয় যেন তাঁহাব বোধাতীত ছিল না। কঠোৰ সত্যকে স্পষ্টভাবে বলিবাব মত সাহস তাহাব মত আৰু কাহাবও ছিল না। সাহিত্য, ইতিহাস, দৰ্শন, বাজ্ঞনীতি, ধৰ্ম্মনীতি ও সমালোচনা এই কয়েকটি বিষয় উক্ত পত্ৰিকায় আলোচিত হইত। মওলানা আবুল কালামকে ব্যক্তিগতভাবে তখন কেই জানিত না। কিন্তু তাঁহাব লেখা পড়িয়া সকলে মনে কৰিত একজন যুগপ্ৰবৰ্ত্তক আবিৰ্ভূত হইয়াছেন। তিনি প্ৰত্যেক বিষয়ে আলোকপাত কৰিতে চেষ্টা কৰিতেন। তৎকালেৰ প্ৰসিদ্ধ লেখকদেৰ পুস্তকেৰ নিৰ্ভীক সমালোচনা কৰিতেন। এই সময় মুসলিম ভাৰতে কবি আলতাফ হোসেন হালি অসীম প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰিতেছিলেন। হালি শ্ৰাব সৈয়দ আহমদেৰ একখানা জীবনী প্ৰণয়ন কৰেন। মওলানা আজাদ তাঁহাব “লিসানুল-সিদ্কে” এই গ্ৰন্থেৰ একটি স্থিতিস্থিত সমালোচনা কৰেন। এই সমালোচনা পশ্চিমাঞ্চলেৰ বহু মুসলিম স্বৰ্গীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। কিন্তু তখন পৰ্য্যন্ত কোন মুসলিম পণ্ডিত এই বালকেৰ সহিত পৰিচিত হইবাব সুযোগ পান নাই।

এই সময় তিনি লাহোবে একটি পণ্ডিতদের সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা কবিবাব নিমন্ত্রণ পাইলেন। ইতিপূর্বে তিনি ছোট ছোট সভায় বক্তৃতা কবিয়াছেন। কিন্তু লাহোবেব বিজ্ঞানের এই সভায় বক্তৃতা দিবাব অবসব তাঁহাব পক্ষে ছিল এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। লাহোবেব “আন্জুমেনে হিমাযেতে ইসলাম” নামক সমিতি “লিসানুল-সিদকব” সম্পাদককে ১৯০৪ সালে তাহাদেব বাৎসবিক সভায় প্রধান অভিভাষণ দিবাব জন্ত আহ্বান কবিল। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নাই। কেবল জানিতেন যে, তিনি একজন যুগান্ত-কাবী লেখক। এই সভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন—কবি হালি, কবি নজিব আহমদ, কবি ইকবাল প্রমুখ কবিগণও ছিলেন। তা ছাড়া নানা অঞ্চল হইতে বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাব বিষয় ছিল—The rational basis of religion। কেহ ভাবিতে পাবেন নাই যে, এই কঠিন বিষয়ে বক্তৃতা কবিবাব জন্ত ষোল সতের বৎসবেব এক বালক ‘আন্জুমেনেব’ নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিতে সাহস কবিবে। যখন কবি হালিব সহিত তাঁহাব পবিচয় কবান হইল, তখন তিনি মনে কবিলেন—এই বালক আবুল কালামেব পুত্র। কিন্তু তাঁহাব আশ্চর্য্যেব সীমা বহিল না, যখন বুঝিলেন যে, এই বালক নিজেই আবুল কালাম—এই ছেনেটি ‘লিসানুল-সিদকব’ সম্পাদক। অতঃপব তাঁহাকে বক্তৃতা দিবাব জন্ত আহ্বান কবা হইল। তাঁহাব বক্তৃতা শুনিয়া সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়া গেল। কি বাগ্মিতায়, কি যুক্তিতর্কেব দিক দিয়া, কি বিষয়বস্তুব গুরুত্বেব দিক দিয়া, কি প্রাঞ্জলতায়, তাঁহাব তিন ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা সকলকে

শুভিত কবিতা দিল। তাঁহাৰা বুঝিলেন, ভাবতে একজন প্রতিভাশালী মানুহ আসিতেছেন। কবি হালি বহুস্ত কবিতা বলিলেন : An old head on young shoulders "

এই ঘটনাবও কিছু আগেকাব কথা। তখন তাঁহাব বংস চৌদ্দ বংসৰ। মাঝে মাঝে তিনি কবিতা লিখিষা অবসৰ বিনোদন কৰিতেন। "নেবাস্তে আলাম" নামক একটি কবিতাব পত্ৰিকাষ বহু কবিতা প্ৰকাশ কৰিষাছিলেন। তাঁহাব নামেৰ শেষে 'আজাদ' শব্দটি হঠাতেছে তাহাব কবি-নাম। উদ্দ কবিগণেৰ মধো একটা বীতি আছে যে, তাঁহাবা মধো মধো একত্ৰ হইয়া কবিতাব প্ৰতিযোগিতা কৰিতেন। ইহাকে বলে "মুশাএবা" অৰ্থাৎ কবিতা-যুদ্ধ। একজন কবি কবিতাব একটি পদ বলিতেন, আৰ সঙ্কে সঙ্কে অন্ত কবিগণ একেৰ পৰ এক পৰবৰ্ত্তী পদগুলি পূৰণ কৰিতেন। ইহাব আববী নাম "মুশাএবা"। আবুল কালাম এই বয়সে এই সব কবিতা প্ৰতিযোগিতাষ যোগদান কৰিতেন এবং সঙ্কে সঙ্কে বচনা কৰিষা কবিতাব পদ পূৰণ কৰিতেন। বালবেৰ অদ্ভুত কবিত্ত জ্ঞান দেখিষা কবিগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বিখ্যাত উদ্দ কবি গানেবেৰ শিষ্ঠ্য নাদিব শাঁ আবুল কালামেৰ কবিতা শুনিয়া মনে কৰিতেন, বোধ হয় এই বালক অপবেৰ কবিতা মুগ্ধ কৰিষা আবুত্তি কৰিতেছে। তিনি পবীক্ষা কৰিবাব জন্ত কঠিন কঠিন কবিতা বচনা কৰিষা আবুল কালামেৰ সম্মুখে উপস্থিত কৰিতেন, আৰ আবুল কালাম সঙ্কে সঙ্কে তাহাৰ পদ পূৰণ কৰিষা দিতেন। ইহাতেও তাঁহাব সন্দেহ ঘুচিল না।। পবে একদিন আবুল কালামকে একাকী পাইয়া ধৰিষা বসিলেন এবং বলিলেন, "বালক। তুমি ত 'মুশাএবাত্তে' শ্লোকেৰ পৰ শ্লোক বলিষা যাও, এইবাব

আমাব এই শ্লোকটির পদ পৃথক কবিয়া দাও।” এই বলিয়া এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন :—

—آء ھو - آء ھو - آء ھو

“ইয়াদ্ না হো, শাদ্ না হো, আবাদ্ না হো”

আব সঙ্গে সঙ্গে আবুল কালাম শ্লোকেব পব শ্লোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন নাদিব গাঁ আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন : “তুমি আমাব অপেক্ষাও ভাল কবি।”

এইভাবে আবুল কালাম সর্বত্র নিজের প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং চাবিদিক হইতে অজস্র প্রশংসা কুড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ইহা মানুষের জীবন নহে। মহৎ যাহাব ব্রত, যুগান্তকাৰী পরিবর্তন যে আনিতে চায়, সে এইভাবে অলস জীবনযাপন করিতে পারে না। আবুল কালাম আব বৃথা সময় কাটাইতে পারিলেন না। পথ বাছিয়া লইবাব জন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহাব অহুসঙ্কিৎসা প্রবৃত্তি উত্তবোত্তব বাড়িয়া চলিল। নানা প্রশ্ন মনে জাগিল। কোন্ পথে যাওয়া তাহাব উচিত, কোন্ ব্রত অবলম্বন করিলে জগতকে কিছু দান করিতে পারিবেন—এই হইল তাহাব চিন্তা। তিনি ১৯০৫ হইতে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত সিবিয়া, মিশর ও আবব প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এই সব প্রদেশ ভ্রমণেব পব তাঁহাব জিজ্ঞাসাব প্রবৃত্তি আবও বৃদ্ধি পাইল। ভ্রমণেব পব স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, দেশে বিপ্লবেব আগুন জলিয়াছে। নূতন নূতন দাবী, প্রগতিমূলক আদর্শ, নব নব স্বপ্ন জাতিব ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহাব দৃবদৃষ্টিব প্রভাবে

৬৭ - ২৬৬
 Acc 22268
 ২২/২/১৯১১

বুঝিলেন, দেশে একটি বিবর্ত আন্দোলন আসিতেছে, তাহাকে প্রতিবোধ করা
কাহারও সাধ্য নাই। এই আন্দোলন দেশের সর্বত্র আগ্নেয়গিরির অগ্নু-
গাবের মত একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিবে। যাহা ইহা হইতে সবিধা
থাকিবে, তাহাদের মৃত্যু স্থনিশ্চিত। তাই আবুল কালাম স্থির করিলেন,
তাঁহাব সমস্ত শক্তি দিয়া এই আন্দোলনকে সাহায্য করিবেন, তাঁহাব যাহা
দিবাব তাহা তিনি দিতে কাতর হইবেন না। এই উদ্দেশ্যে নানা দলের
লোকের সহিত আলাপ আলোচনা করিলেন। বাঙলার সন্ত্রাসবাদী
আন্দোলনের সহিত সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। সবকালের
সি আই ডি বিভাগ বুঝিল একজন প্রচণ্ড বিপ্লবী মানুষ কর্মক্ষেত্রে কাঁপ দিতে
উদ্ভূত। তাহা গোপনে আবুল কালামের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।
তিনি সাধাবণভাবে যেমন দেশের কথা ভাবিয়াছিলেন, সেইরূপ বিশেষভাবে
ভাবতে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। কি ভাবে
মুসলমানের উন্নতি হইতে পাবে, তাহা তাঁহাব চিন্তাব বিষয় হইল। সার মৈয়দ
আহমদের প্রভাবে মুসলমান যুবক রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে-
ছিল। মওলানা আবুল কালাম তাহাদের মনে রাজনৈতিক চেতনা আনয়ন
করিবাব জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ধর্মের প্রগতিমূলক ব্যাখ্যা, আব
রাজনীতিতে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার—এই দুইটি ব্রত অবলম্বন করিয়া মওলানা
আবুল কালাম কর্মক্ষেত্রে কাঁপাইয়া পড়িলেন।

— — —

“আল্ হেলালের” জন্ম

মওলানা আবুল কালাম মিশব হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন কবিয়া দেখিলেন যে, সাব সৈয়দ আহ মদেব প্রভাবের ফলে সমগ্র মুসলমান সমাজে ব্রিটিশ-ভক্তিবান ডাকিতেছে। বিদেশী শাসনকে তাহাবা বিধাতার আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ কবিতো শিখিয়াছে। আব তাহাদেবকে জাতীয় আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন কবিবার জন্য ভেদনীতি সফলতার মধ্যে ক্রিয়া কবিতোছে। একদিকে জাতীয়তাবাদী হিন্দুগণ নানাভাবে ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠানেব মধ্য দিয়া দেশেব মুক্তিব জন্য সংগ্রাম কবিতোছে, আব অন্যদিকে মুসলমানের বড় বড় নেতাগণ ব্রিটিশ ভক্তিব পবাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। মুসলিম যুবকগণ মনে প্রাণে, দেহে আত্মায়, নিজেদের দাসত্বকে মঙ্গলকর বলিয়া বরণ কবিয়া লইতেছে। মওলানা আজাদ স্থির কবিলেন, তাঁহাব সমস্ত শক্তি ও সাধনা দিয়া মুসলমানের এই দাস মনোভাবের পবিবর্তন সাধন কবিবেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহাব ধমনীতে, বক্তের প্রতি বিন্দুতে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বীজ প্রবাহিত হইতেছিল। তাঁহাব পিতা স্বচক্ষে সিপাহী বিপ্লবের সমস্ত ঘটনা নিবীক্ষণ কবিয়াছিলেন। ইহাব ফলে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রত্যেক বস্তুকে অন্তরের সহিত ঘৃণা কবিতেন। মওলানা আজাদ পিতাব পদতলে অন্যান্য শিক্ষাব সহিত এই বিদ্রোহভাবও শিখিয়াছিলেন। একথা সত্য যে, সাব সৈয়দ আহমদ ধর্মসংস্কার বিষয়ে মুসলমান সমাজের অনেক উপকার কবিয়াছিলেন। তিনি অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি ও মধ্যযুগীয় তাবধাবা হইতে

মুসলমান সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যদিক দিয়া মুসলমান সমাজেব মহা অনিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদেব বাজনৈতিক চেতনাব পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসেব সংশ্রব পবিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া তাহাদেব বাজনৈতিক চেতনাবোধকে অসাড় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাব ফলে কয়েক যুগ ধরিয়া মুসলমান সমাজ সকল প্রকার উন্নতিমূলক বাজনৈতিক আদর্শ ও জীবন্ত কর্মধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেব সাধারণ আন্দোলন হইতে তাহাদেব নাড়ীব নোগ কাটিয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ, সাব সৈয়দ আহমদ প্রকাবস্তবে ভাবতেব বাজনৈতিক মুক্তিব পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; মুসলমান সমাজেব মজ্জায় মজ্জায় ব্রিটিশ-প্রীতিব ভাব প্রবেশ কবাইয়াছিলেন। জাতীয় সম্মান, সুউচ্চ মন, স্বাধীনতাৰ জন্য আগ্রহ ও বাজনৈতিক দৃবদর্শিতাব পবিবর্তে তিনি জাগাইয়া দিয়াছিলেন পবাজ্যেব মনোভাব, দাসত্বে আত্মসম্মানতাৰ ভাব, স্বাধীনতাৰ প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। আমবা স্বীকাৰ কবি যে, সাব সৈয়দ আহমদ ইচ্ছা করিয়া এসব কবেন নাই। কিন্তু এই সব করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পাবেন নাই। সবকাবেব অল্পগত এজেন্ট ব্যতীত আব কেহ যে একুপ করিতে পাবে না, তাহাও তিনি বুঝিতে পাবেন নাই। সাব সৈয়দ আহমদেব ভুলেব সংশোধন করিবার ভাব লইলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ।

মওলানা আজাদ আলিগড় দলেব শ্রোতে ভাসিয়া গেলেন না। তিনি স্থিৰ কবিলেন, আলিগড় দলেব এই মনোভাব দূব করিবার জন্য সমস্ত শক্তি

প্রায়াগ কবিবেন। ১৯০৮ সালে তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। তাঁহার অন্তরে এক অদ্ভুত সাহসেব উদয় হইল। তাঁহার কর্মপন্থা একটা বিপজ্জনক পথ অবলম্বন কবিল। ইতিমধ্যে তাঁহার মনে এক প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। দেশেব তথা মুসলমান সমাজেব বাজনৈতিক অবস্থা তাঁহার এই আলোড়নেব একটা প্রধান কাৰণ। বাঙলা দেশই তাঁহার কর্মক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইল। এই দেশকে তিনি মনে প্রাণে ভালবাসিতে লাগিলেন। আর এই বাঙলাতে জাগরণ ও চাকল্যেব এক অপূৰ্ণ তবঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি দেখিলেন, ভাবতে দুই প্রকাৰ বাজনীতি চলিতে পারে— বিপ্লবমূলক তথা জাতীয়তামূলক আন্দোলন, অথবা সবকাবী পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। প্রথম শ্রেণীৰ আন্দোলনেব নেতৃত্ব কবিত্তেছিল হিন্দু যুবকগণ, আর দ্বিতীয় শ্রেণীৰ আন্দোলন মুসলমান সমাজকে নানা প্রলোভন দ্বাৰা আকর্ষণ কবিত্তেছিল। এই শোষোক্তগণ স্বণিক সুবিধাব মোহে সকল প্রকাৰ বাজনৈতিক সংগ্রামেব বিকক্ষে সবকাব পক্ষেব পতাকাব তলে দাঁড়াইয়া আছে। যে সবকাব বাজনৈতিক সংগ্রামকে দমন কবিত্তে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, মুসলমান সমাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদেবই হাতেব পুতুল সাজিয়া গিয়াছে। যে যুগে নব্যভাবত স্বাধীনতা ও মুক্তিব নামে বৈদেশিক বন্ধন দুব কবিবাব জন্ত দেশময় আন্দোলন কবিয়া বেড়াইতেছে, সে যুগে বাজভক্তিব ‘স্লোগান’ তুলিয়া মুসলমান সমাজেব নব্য যুবকগণ আত্মপ্রসাদ লাভ কবিত্তেছিল। এই বিসদৃশ দৃশ্ত যুবক আবুল কালামকে ঋণাত্মিক পীড়া দিল। তাঁহার সহধর্মিণী সবকাবেব আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া বিশ্বের নিকট গেলাব সামগ্রী হইবে, সবকাবেব হাতে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত

হইবে—এ অবস্থা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। মুসলমানের মানসিকতার মধ্যে বিপ্লব সাধন করিবার জন্য তাঁহার মন আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। কি ভাবে বিপ্লব আনা সম্ভব হইবে তাহা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্বিবিধ কর্মধারা গ্রহণ করিয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমতঃ আলিগড় দলের মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের অন্তর হইতে বৈদেশিক শাসনের প্রতি আত্মগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি স্তব করিলেন, একটি পত্রিকা প্রচার করিবেন। ইহাই হইল “আল্ হেলালেব” (অর্ধচন্দ্র) উৎপত্তির মূল কাবণ। ১৯১২ সালের ১৩ই জুলাই ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি মুসলিম-জগৎ হইতে “মওলানা” বনিয়া অতিহিত হইতেছিলেন। পববর্তী যুগের মুক্তিকামী মওলানা মহম্মদ আলি সেই সময় বাজতক্তির জন্য আত্মপ্লামা অহুতব করিতেন। তাই “আল্ হেলালেব” বাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু “আল্ হেলাল” যে একটা নূতন যুগের ইঙ্গিত দিয়াছে, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সম্পাদিত “কমবেড” (Comrade) পত্রিকায় তিনি ‘আল্ হেলাল’ সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :—“ইহা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইহার সুদক্ষ সম্পাদক মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রকাশের পূর্বে যে পবিশ্রম ও িপুল ব্যয় করিয়াছেন তাহা আমবা বেশ বুঝিতেছি। ইহা সংবাদপত্র জগতে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। ইহার বিভিন্ন

কলমে চিত্র পবিবেশন ইহাব স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ধবণের উর্দু অক্ষরের পবিবর্তে নূতন ধবণেব আববী টাইপ ইহাব আকর্ষণ আরও বাড়াইয়া দিবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ইহাব স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া তুবস্ক, পাবস্ক, মরক্কো এবং অন্যান্য মুসলিম জগতেব অবস্থা বীতিমতভাবে ইহাতে থাকিবে।” মওলানা মহম্মদ আলি এই পত্রিকা সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছেন, কিন্তু স্কুশলে ইহাব বাজনীতি ও পলিসিব কথা একেবাবে পবিহাব কবিয়াছেন। কাবণ তখন পর্য্যন্ত তিনি ব্রিটিশ ভক্ত ছিলেন। তাঁহাব ‘কমবেড’ তখন বাজতস্তি প্রচার কবিত এবং আলিগড়েব চিন্তাধাবা অনুসবণ কবিয়া চলিত। সেই জন্ত যে কেহ রাজনীতিতে ভিন্ন মত পোষণ কবিত, তাহাকে তিনি স্নেহেব চক্ষে দেখিতেন না। তাই মওলানা আজাদেব বাজনীতিব বিকন্ধে তিনি তীব্র লেখনী পবিচালনা কবিয়াছিলেন। কিন্তু পবে তিনিই মওলানা আজাদেব শিষ্টত্ব গ্রহণ কবিত লজ্জাবোধ কবেন নাই।

মওলানা আজাদ কাহাবও মতামতেব পবোওয়া না কবিয়া এবং বন্ধু বিচ্ছেদেব ভয়ে ভীত না হইয়া স্বাধীনভাবে একাকী নিজেই মুক্তিব পতাকা হাতে লইয়া ‘আল্ হেলাল’ প্রচার কবিলেন। স্বাধীন চিন্তা, নিতীক মনোভাব, সংস্কার ও বিপ্লব—ইহাই হইল তাঁহাব পথেব সম্বল। ‘আল্ হেলালেব’ দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি উহার উদ্দেশ্য বর্ণনা কবিলেন। উহা প্রকাশিত হইবা মাত্র মুসলিম-ভাবেব বারাদেব মত একটা প্রচণ্ড বিস্ফোটন সৃষ্টি কবিল। তাহাদেব চিন্তাধাবাব মধ্যে মূলগত কোন গলদ আছে কি না তাহা একবার চিন্তা কবিয়া ভাবিবাব জন্ত ‘আল্ হেলাল’ সমগ্র মুসলিম সমাজকে স্তব্ধ

কবিতাে বাধ্য কবিল। স্ত্রাব সৈয়দ আহমদ, সমাজেব গোডামী ও বঙ্গশীল মনোভাবেব বিরুদ্ধে সাফল্যেব সহিত সংগ্রাম কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাব ব্রিটিশ-ভক্তিব জন্ত সমাজেব মৰ্যো যে বাঙ্গনৈতিক বশ্বতা ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ কবিয়াছিল মওলানা আজাদ তাহাব বিরুদ্ধে অনববত লেখনী পবিচালনা কবিতাে লাগিলেন। যখন নবাব মুশতাক হোসেন প্রকাশ্বভাবে ঘোষণা কবিলেন :—“The sword of Islam would be always ready in the service of British raj” — যে যুগে মওলানা মহম্মদ আলি ঘোষণা কবিতেন : “বাজভক্তি মুসলমানেব বশ্ব বিশ্বাসেব অঙ্গ”, আব যে যুগে আলিগড়েব পাস কবা যুবকগণ নিজেদেব পবাবীনতায গৰ্ব্ব অনুভব কবিত—সেই যুগে, মুসলিম মানসিকতাব সেই নিদারুণ দিনে, যুবক আবুল কালাম ঘোষণা কবিলেন : স্বাধীনতা মুসলমানেব জন্মগত অধিকার। তাহাব দুৰ্দ্ধাব লেখনীব তববাবি সমাজেব দাম মনোভাবেব বিরুদ্ধে অবিবাম সংগ্রাম চালাইতে লাগিল।

“আল্ হেলাল” প্রকাশিত হইবাব কয়েক সপ্তাহেব মৰ্যো দেশেব মধ্যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার কবিল। সৰ্ব্বত্র একটা চাকল্য সৃষ্টি হইল। কয়েক মাসেব মধ্যে ইহাব গ্রাহক সংখ্যায় এগাব হাজাবে দাঁড়াইল। মনে বাখিতে হইবে যে, ইহাব বার্ষিক চাঁদা ছিল আট টাকা। এই বিবেচনায় এগার হাজাব কাটতিকে অসামান্য সাফল্য বলিতে হইবে। তা ছাড়া ইহাব অধিকাংশ পাঠক ছিল মুসলমান। প্রতিক্রিয়াশীলদেব মধ্যে ইহা একপ আলোডন সৃষ্টি কবিল যে, অল্পদিন পবে সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খাঁ “আল হেলালেব” বিরুদ্ধে প্রকাশ্বভাবে আন্দোলন কবিতাে কুণ্ঠিত হন নাই।

পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইত কলিকাতায়। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা আদবেব সহিত গৃহীত হইত। স্থানে স্থানে “আল্ হেলাল” পড়িবার জন্য ও আলোচনা কবিবার জন্য পাঠচক্র গঠিত হইল। সেখানে বহু পণ্ডিত ও আলেমগণ আসিয়া আলোচনায় যোগ দিতেন। মুসলিম স্ত্রীদেব উপর ‘আল্ হেলাল’ বিরূপ প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল তাহার দু’একটা দৃষ্টান্ত দিব। মওলানা মহম্মুল হোসেন দেওবন্দের একজন সুবিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি স্বীকার কবিয়াছেন যে, “আল্ হেলাল” পড়িবার পূর্বে বাঙ্গালী ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। বস্তুতঃ ‘আল্ হেলালেব’ প্রভাবেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালীতে অংশ গ্রহণ কবিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্ম কাবাবরণ পর্য্যন্ত কবিয়াছিলেন। মওলানা মহম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলি ও ডাক্তার ইক্বালকে ইসলামের মহিমার প্রতি “আল্ হেলালই” আকৃষ্ট কবিয়াছিল। মওলানা আজাদই তাঁহাদিগকে ইসলামের সত্যিকারের রূপের সহিত পরিচিত কবাইয়াছিলেন। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে মওলানা মহম্মদ আলি “কমবেডে” মওলানা আজাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরে মওলানা আজাদের মত গ্রহণ কবিয়াছিলেন। মওলানা শওকত আলি প্রকাশ্যভাবে স্বীকার কবিয়াছেন যে, “আল্ হেলাল নে হাম কে। ইমান্‌কা বাস্তা বাতা দিয়া” (অর্থাৎ আল্ হেলালই আমাকে ইমানের পথ দেখাইয়াছে)। কবি শ্রীর ইক্বালেব বিখ্যাত গ্রন্থ “আসবার-এ-খুদী” ও “বমুজে-বে-খুদী” আল্ হেলালেব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। শ্রাব ইক্বালেব ইসলাম সম্বন্ধে কয়েকটি স্ফুটিত

৩০ মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ

প্রবন্ধ আছে—বলা বাহুল্য তাহাব মূল আদর্শ ও প্রেরণা তিনি মওলানা আবুল কালামের আল্ হেলাল হইতে পাইয়াছিলেন।

“আল্ হেলালে” মওলানা আজাদ তাঁহার বাঙ্গানৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ অকপটে ব্যক্ত কবিতেন। দ্বিধাগ্রস্তভাবে কোন কথা বলেন নাই। সুস্পষ্ট, সুতীব্র ও জ্বলন্ত ভাষায় মনেব কথা প্রচার কবিতেন। ১৯১৩ সালে অযোধ্যা প্রদেশে গো-বধ লইয়া একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল। সেই সময় মওলানা আজাদ নির্ভীকভাবে মুসলমানদিগকে উদ্দেশ্য কবিয়া বলিয়াছিলেন, “ইসলাম শাস্তিব ধর্ম। গো-বধের অধিকার উপর অত্যধিক জোব দিলে অশান্তিব সৃষ্টি হইবে। তাহা হইলে উহা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিব পথে বিঘ্ন উৎপাদন কবিতে পারে।” “আল্ হেলালে” তাঁহার এই দুঃসাহসিক আলোচনা দেখিয়া তাঁহার অন্তবদ্ব বন্ধু হাকিম আজমল খাঁ তাঁহার উপর বাগান্বিত হইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে বহু আলোচনা ও তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু পবে ১৯২০ সালে হাকিম সাহেব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং মওলানা আজাদের উদার ধর্মব্যাখ্যা গ্রহণ কবেন। মওলানা মহম্মদ আলিও এক সময় মওলানা আজাদের তীব্র সমালোচক ছিলেন। পবে তিনিও মওলানা আজাদের ভক্ত ও সমর্থক হইয়া পড়েন। “আল্ হেলালেব” প্রভাব ভারতব বাহিবেও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মিশরের বহু পত্রিকায় ইহাব আববী অনুবাদ প্রকাশিত হইত। নিকট প্রাচ্যেব মুসলিম জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে সব আলোচনা কবিতেন, তাহা এদেশে একেবারে নূতন জিনিষ। ইউরোপীয় ঘটনা এরূপভাবে ঘটিতে লাগিল যে, মওলানা আজাদের

যেব নিদুকগণও স্বীকার কবিত্তে বাধ্য হইলেন যে, তিনি যে পথের সন্ধান দিতেছেন তাহাই ঠিক পথ, তাহাই একমাত্র পথ, অন্য পথ আব নাই।

মুসলিম জগতের উপর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অবিচার ও অত্যাচার তথায় এক নূতন যুগ আনয়ন করিতেছিল। কিন্তু তাবতেব ভেদনীতির প্রভাবে সে যুগ আসে নাই। মুসলমান সমাজকে অধিকতর রাজতন্ত্র কবিত্তে জগত নানারূপ চেষ্টা হইতেছিল। মওলানা আজাদেব এই “আল্ হেলাল” সে সমস্ত চক্রান্তজাল ভেদ কবিত্তা মুসলমানকে আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দিল। উহা প্রকাশের ছয়মাস মধ্যে একদল মুসলমান যুবক ‘আল্ হেলালের’ যুক্তির সাববত্তা উপলব্ধি কবিলেন। তাঁহাবা একটা নূতন বাজ্ঞনৈতিক চেতনা লাভ কবিলেন। আলিগড় দলের প্রভাবে যাহারা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদেব অনেকে ‘আল্ হেলালের’ প্রভাবেব নিকট নিজেদেবকে অসহায় মনে কবিল। মিঃ ওয়াজিব হোসেন (বর্তমানে স্তাব) সে সময় মুসলিম লীগেব সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথমে কঠোবভাবে ‘আল্ হেলালের’ আদর্শেব বিরুদ্ধে আন্দোলন কবিত্তাছিলেন। কিন্তু পবে মওলানা আজাদেব সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তা বহু আলোচনাব পব নিজেব ভ্রম বুঝিতে পাবিলেন, এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁহাব নিকট আত্মসমর্পণ কবিলেন। মওলানা আজাদেব প্রভাবে পড়িয়াই তিনি মুসলিম লীগেব ক্রীড পবিবর্ত্তন কবিত্তে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত লীগেব ক্রীডে ছিল : “Loyal to British government, and the attainment of the rights of the Musalmans.”

কিন্তু সেই বংসব মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে উক্ত শব্দগুলির পৰিবর্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলি লীগের ক্রীড়ে সন্নিবিষ্ট হইল :—“attainment of suitable self-government for India” এই বংসব মুসলিম লীগ সর্বপ্রথম বাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত দল আখ্যা লাভ করিল। লীগের ক্রীড়ের এই পৰিবর্তনের মূলে আছে মওলানা আজাদের প্রভাব। কিন্তু মওলানা আজাদ ‘suitable’ কথাটাও পছন্দ করেন নাই। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, লীগের ক্রীড়ে বাজানুগত্যের কোন স্থান নাই। তিনি তৎপৰিবর্তে ‘পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন’ কথাটা বসাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মওলানা মহম্মদ আলি বাজানুগত্যের প্রতি অত্যধিক জোব দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাব এই আচরণ আজ অনেকের নিকট অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু তখন তিনি বাজানুগত্যের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি এই ভাবে দিলেন। তিনি ‘কমবেড’এ লিখিলেন : “মুসলমান হইতে গেলে জীবনে একবার মাত্র ‘কলমা’ পড়িলেই চলিবে। কিন্তু ধার্মিক মুসলমান ইহাতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে দৈনিক নামাজের সময় বহুবার ‘কলমা’ উচ্চারণ করে। সেইকপ যদিও আমবা বৃটিশ সবকাবের অনুগত, তবুও আমবা বাজতন্তু হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব না, আমবা সব সময় এই বাজানুগত্যের কথা ঘোষণা করিব। জীবনের প্রত্যেক কাজে বাজানুগত্যের পরিচয় দিব।” মওলানা আজাদের সঙ্গে মওলানা মহম্মদ আলি এইখানে পার্থক্য ছিল। শেষ পর্য্যন্ত মওলানা মহম্মদ আলি মওলানা আজাদের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলানা আজাদ সেই যুগেই একটা উচ্চতম আদর্শ লইয়া সমাজকে আহ্বান

কবিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজেব বড বড পণ্ডিতগণ তখনও তত দূর যাইতে সাহস কবেন নাই। ইহাকেই বলে প্রতিভা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি।

১৯১৪ সালে ইউরোপীয় মহাসমর বাধিয়া গেলে এই সময় ‘আল্ হেলালেব’ লোকপ্রিয়তা আরও বাড়িয়া গেল। তাবতের সর্বত্র প্রায় পঁচিশ হাজার কপি বিক্রীত হইত। উহার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের কথা দুইটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পাৰা যাইবে। মিঃ ফিলবী (Mr. Philby) একজন মিভিলিয়ান সাহেব, মূলতানে চাকুরী করিতেন। ‘আল্ হেলাল’ সম্বন্ধে পাঞ্জাব সরকারকে বিপোর্ট দিবার জন্ত তিনি বিশেষভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ ভাল উর্দু জানিতেন। ‘আল্ হেলালেব’ ভাষার স্বাক্ষর ও ভাবের গাভীৰ্ব্য দেখিয়া একরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একবার কোন কার্যব্যাপদেশে কলিকাতায় আসিয়া মওলানা আজাদেব সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সাক্ষাতের পৰ মওলানা আজাদকে তাঁহার উচ্চাঙ্গের লেখন-ভঙ্গীৰ জন্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি মওলানার সংস্পর্শে আসিয়া আববী শিথিতে মনস্থ কবিলেন, এবং মেমোপটেমিয়া গিয়া “Heart of Arabia” নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপ :—মওলানা আজাদ প্রথম প্রথম বাঙলা দেশের বিপ্লবী দলেব সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই জন্ত গোয়েন্দা বিভাগ তাঁহার উপর সততঃ প্রথর দৃষ্টি রাখিত। এই বিভাগেব প্রধান কর্তা স্যার চার্লস ক্লিভল্যাণ্ড (Sir Charles Cleaveland) তাঁহাকে এই বাপারে বিজড়িত করিবার জন্ত সততঃ মালমসলা সংগ্রহ কবিতেন। ১৯১৪ সালের

নভেম্বর মাসে মওলানা বুঝিতে পারিলেন যে, ‘আল্ হেলালের’ ও তাঁহার নিজের ভাগ্য এক মহা পবীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। ঠিক এই সময় এলাহাবাদের ‘পায়োনিয়ার’ (Pioneer) সংবাদপত্র কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মওলানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কবে যে, তিনি জার্মানীতে হইয়া প্রচারকার্য চালাইতেছেন। ‘আল্ হেলালের’ উপর কিরূপ মতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হইত, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে। ‘পায়োনিয়ার’ একটি প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল : “আল্ হেলাল একটি স্ফটিক উদ্ভূত সাপ্তাহিক পত্র। ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। আবুল কালাম নামক একজন দিল্লীওয়াল মুসলমান ইহা সম্পাদক। এই সব প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে ইহা বহুল প্রচার আছে। ভাবতের অপরাধ অঞ্চলে ইহা চলিয়া থাকে। যুদ্ধ ঘোষণার সময় হইতে ইহার টান জার্মানীর দিকে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, সবকাল এখনও এই পত্রিকাকে প্রকাশ করিতে অগ্রমতি দিতেছেন। ইহার কারণ এই যে, উদ্ভূত প্রকাশিত হয় বলিয়া কলিকাতায় ইহা ভাষা খুব কম লোকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বোধ হয় ইহা সম্পাদক এই জন্ত কলিকাতা হইতে এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আর একটা কারণ ইহাই মনে হয় যে, ‘আল্ হেলালের’ ভাষা খুব উপমাবহুল। ইহা গোপন ইঙ্গিত, বিদ্রূপ ও নানাবিধ অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা অনেকে ধ্বিষ্টে পারে না। এই ভাষা যখন ইংবেজিতে অনুবাদ হয়, তখন ইহা মূল অর্থ অন্তর্নিহিত হইয়া যায়, অথবা ইহা যে অর্থ বুঝাইতে চায় অনুবাদে তাহা প্রকাশ হয় না। ইউরোপীয় কর্মচারীগণ মূল ভাষা পড়িতে পারেন না।” ইহা পব ‘আল্ হেলাল’ হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া ‘পায়োনিয়ার’

বলিতেছেন : “আমবা নিরাপদে বলিতে পরি যে, এই সময় সরকার যদি একজন বৃটিশ প্রজাকে এই ধরনের লেখা প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে বলিব, সবকার অন্তায়ভাবে উদাবতা দেখাইতেছেন।”

সে যাহা হউক, মওলানা আজাদ যে অশেষ শক্তিশালী লেখনী পরিচালনা করিতেন, তাহাব প্রভাব যে বহু লোককে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহাব প্রবন্ধগুলি এমন সব চিত্র ও সংবাদ দ্বারা পূর্ণ থাকিত যে, তাহা বহু ইংবেজি পত্রিকাতেও পাওয়া যাইত না। তাছাড়া অপ্রিয় সত্য বলিবার তাঁহাব অসীম সাহস ছিল। সেই জন্য সবকার ‘আল্ হেলালকে’ আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আঠাব মাসকাল সবকার ‘আল্ হেলালেব’ উপব হস্তক্ষেপ কবেন নাই। কিন্তু ‘পায়োনিয়াবেব’ মন্তব্যেব পব আব উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। প্রথমে ‘আল্ হেলালেব’ জামিন বাজেয়াপ্ত কবা হইল। কিন্তু ইহার পূর্বে কয়েকটি প্রদেশে ‘আল্ হেলালেব’ প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। জামিন বাজেয়াপ্তিব পব মওলানা আবুল কালামের উপব আদেশ হইল—তিনি পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজে প্রবেশ করিতে পাইবেন না। তৎপর ১৯১৫ সালের ৭ই এপ্রিল বাঙলা সবকার তাঁহাকে বাঙলা হইতে বিতাড়িত করিলেন। তিনি বাধ্য হইয়া স্বাস্থ্যলাভের আশায় বাঁচিতে আশ্রয় লইলেন। সেখানে তাঁহাকে ভাবত সবকার অন্তবীণে আবদ্ধ করিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি মসজিদে গমন করিয়া নামাজ পড়িতেন, শুক্রবারে ইমামতি করিতেন ও ‘খোতবা’ পাঠ করিতেন। তাঁহাকে পড়িবার জন্য পুস্তকাদি দেওয়া হইয়াছিল। এইখানে এই অবস্থায় তিনি ‘তাজ্কীরা’ (বা আত্মজীবনী) ও পবিত্র

৩৬ মনৌষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ

কোব-আন-শরীফের কিয়দংশ ভাষ্যসহ উর্দুতে অনুবাদ করেন, বাহা পরে “তারজুমাহুল-কোব-আন” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশেষে ভারত সরকার তাঁহাকে ১৯২০ সালের প্রথম দিকে মুক্তি দিলেন। মুক্তির পর তাঁহার জীবনের আব এক অধ্যায় আবস্তু হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগ

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে মওলানা আজাদ যে ত্যাগ, কর্মকৌশল ও রাজনীতি জ্ঞানের পবিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। অন্তরীণ হইতে মুক্তি পাইয়া মওলানা আজাদ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেন না। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, বিশ্রামেব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি সেদিকে লক্ষ্য কবিবাব অবসর পাইলেন না। তিনি এক নব যুগের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কর্মচাঞ্চল্য, এই জাগরণ ও এই সাহসিকতার জন্ত তিনি এতদিন সাধনা করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার স্বপ্ন পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, আব তিনি স্বাস্থ্যেব অজুহাতে বিশ্রাম কবিবেন? ইহা তাঁহার প্রকৃতিব বিরুদ্ধে। তিনি মুক্তি পাইয়া দেখিলেন—দেশের সর্বত্র জাগরণের বিপুল সাড়া পড়িয়াছে। রাউলট আইনেব প্রতিবাদ কবিবাব জন্ত মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে চাবিদিকে অপূর্ব সাড়া পড়িয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতে একটা স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। পাঞ্জাবে ইহার তীব্রতা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, সরকার সীমা লঙ্ঘন কবিয়া অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগে নিষ্ঠুরতার পবাকার্থা দেখাইলেন। জালিনওয়ালাবাগে হিন্দু-মুসলমান ও শিখের বক্ত একই স্থানে মিলিত হইল। এই ঘটনা দেখিয়া মওলানা আজাদ বলিতেছেন: “যে অস্থায়ী কারণে স্মার সৈয়দ আহমদ মুসলমানের কংগ্রেসে যোগদানেব পথে যে অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কবিয়াছিলেন,

আজ ত্রিশ বৎসর পূর্বে জেনেরাল ডায়ার চিবস্তায়ীভাবে সেই প্রাচীর ভাঙিয়া দিলেন, এবং তাবতেব মুসলমানকে ১৯১৯ সালের অমৃতসবে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান কবিবার পথ সুগম কবিয়া দিলেন। ইহা যেন ভারতেব জাতীয়তাব অগ্রদূত। ডায়াবেব নৃশংস বুলেট হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য কবিল না। যে শিখ সম্প্রদায় মুসলমান অপেক্ষাও অধিক রাজভক্ত ছিল, তাহাবাও হিন্দু ও মুসলমান শহীদদের সহিত তাহাদের পূণ্যভূমি অমৃতসবে নিজেদের বুকের রক্তে বঞ্জিত কবিয়াছিল। এই সবেব পশ্চাতে যেন খোদাব হাত ছিল।” পাঞ্জাব অনাচারেব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়াছিল খেলাফত্ অনাচার। বিগত প্রথম মহাসমবেব সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ ভারতেব মুসলমানকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাহাদের পবিত্র তীর্থস্থান যথা মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেমেব পবিত্রতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ কবা হইবে না। কিন্তু বিজয় লাভের পর মিত্রপক্ষ সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা কবিলেন না। মিত্রপক্ষেব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ভারতেব মুসলমান সমাজ মর্মাহত হইল। তাহাবা সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট সহ কবিয়া এই আচবেব প্রতিবাদ করিতে ও ব্রিটিশ সবকাবেব সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিতে সক্ষম কবিল। কতকগুলি নেতৃস্থানীয় মুসলমান তখনও পর্য্যন্ত ব্রিটেনের উপর আস্থা হাবান নাই, ব্রিটেনেব বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দীহান হইতে পাবেন নাই। তাই তাঁহাবা বড় লাটেব নিকট তাঁহাদের অভিযোগ পেশ কবিয়া একটি ডেপুটেশন প্রেবণ কবিলেন। ইহাব বহু বৎসর পূর্বে কর্তৃপক্ষেব ইজিতে মাননীয় আগা খাঁ পৃথক নির্বাচন দাবী কবিবার জন্য বড় লাটেব নিকট একটি ডেপুটেশন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার আবেদন

সহজেই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এ ডেপুটেশন স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাতে ভেদনীতির সমস্ত কূট কৌশল ব্যর্থ হইতে পারে। তাই এই ডেপুটেশনের দ্বারা কোন ফল হইল না। নেতাবাও ছাড়িবাব পাত্র নহেন। তাঁহারা বিলাতেও একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল। ব্রিটিশ সবকাব বহু বৎসরের কূটনীতির পর নিকট-প্রাচ্যে যে সব সুবিধা পাইয়াছেন তাহা কি পরাধীন ভারতের কতকগুলি ভদ্রলোকের ডেপুটেশনের অহুবোধে পবিত্যাগ করিতে পাবেন? যখন মুসলিম নেতারা ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, এই ধরণের ডেপুটেশনে কোন কাজ হইবে না, তখন তাঁহারা অন্য উপায় অব্বেষণ করিতে লাগিলেন। হাতের নিকট পাইলেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাব অস্ত্র। তাহাকেই তাঁহারা সানন্দে তুলিয়া লইলেন। একদল বিজ্ঞ মুসলিম প্রত্ন তুলিলেন, অহিংস অসহযোগ ইসলামের অহুমোদিত নীতি কি না? যখন এই প্রকার সন্দেহদোলায় মুসলমান নেতগণ ঢুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় মওলানা আজাদ তাঁহার বিশ বৎসরের সাধনা লইয়া তাঁহাদের নিকট খোদার আশীর্বাদস্বরূপ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গভীর জ্ঞান, অপূর্ব প্রতিভা ও শিক্ষা-সাধনা, অতুলনীয় বাগ্মিতা, অদ্ভুত দৃঢ়তা ও চিন্তাশক্তি, প্রথর দূরদৃষ্টি ও যুগোপযোগী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী—এই লইয়া তিনি প্রস্তুতই ছিলেন। মুক্তি পাইয়াই তিনি এই কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। অত্যান্ত বহু মুসলিম-নেতা অপেক্ষা তিনি বয়সে ছোট ছিলেন। কিন্তু যোগ্যতায় তিনি সকলের উর্দে ছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া গান্ধীজির শক্তি বহু গুণ বাড়িয়া গেল—“He was a tower of strength to Gandhiji।” মওলানা আজাদ সমস্ত শাস্ত্র ঘাঁটিয়া দেখাইয়াছিলেন যে,

উপস্থিত অবস্থায় অহিংস অসহযোগ ব্যতীত মুসলমানের অন্য কোন পথ নাই।

ইহাব পূর্বে গান্ধীজির সহিত তাঁহার কোন পবিচয় ছিল না। ১৯২০ সালের ১৮ই জানুয়ারী দিল্লীতে তিনি গান্ধীজির সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ দিল্লীতে বড় লাটের নিকট ডেপুটেশন লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। খেলাফত তথা তুরস্ব সম্বন্ধে ভাবতের মতামত বড় লাট সকাশে নিবেদন কবাই ছিল এই ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য। যদিও এই ডেপুটেশনে মওলানা আজাদও স্বাক্ষর কবিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে কিছুতেই বড় লাট সকাশে যাইতে সম্মত হন নাই। তিনি স্পষ্টভাবে বলিলেন: “ইহাতে কোন কাজ হইবে না। ইহা বাস্তব পন্থা নহে। প্রকৃত কাজ করিতে হইলে সংগ্রামমূলক কাজ করা দরকার।” মওলানা মহম্মদ আলি ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু তিনি অচল, অটল। যাহা হউক, তাঁহাকে বাদ দিয়াই ডেপুটেশনের নেতাগণ বড় লাটের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মওলানা আজাদ যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই হইল। বড় লাট উত্তর দিলেন যে, তাঁহার কিছু করিবার হাত নাই। তবে এই আশ্বাস দিলেন যে, যদি নেতাগণ বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। অতঃপর ডেপুটেশনের নেতারা স্থির করিলেন যে, মওলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্বে বিলাতে একটি ডেপুটেশন যাইবে। তিনি (মহম্মদ আলী) যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই সময় আর একটা প্রশ্ন উঠিল। নেতাগণ কি ডেপুটেশন লইয়া ক্ষান্ত

থাকিবেন, না তৎসঙ্গে অন্য কোন সাক্ষাৎ সংগ্রাম বা পন্থা গ্রহণ করিবেন ? মওলানা আজাদ দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে, ভিক্ষা, প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন ও ডেপুটেশনের যুগ চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে ও সক্রিয়ভাবে সরকারকে চাপ দিবার জন্য একটা কর্মপরিক্রমা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ নেতা মওলানা আজাদের পথে যাইতে অসম্মতি জানাইলেন। তাঁহারা ব্রিটিশের বিচার-বুদ্ধিতে তখনও বিশ্বাস হাবান নাই—মওলানা মহম্মদ আলিও তখন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সংগ্রামের ঘোষ বিবোধী ছিলেন। তা ছাড়া অধিকাংশ নেতাদের গঠনমূলক প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন ধাবণা ছিল না। আব যদি কেহ এইরূপ কোন প্রস্তাব উপস্থিত কবিতেন, তবে তাহার দোষ ত্রুটি দেখাইতে আগ্রহান্বিত হইতেন।

ইহাৎ কোন নেতা একটা সর্ববাদী সম্মত পরিকল্পনা রচনা করিতে পারিলেন না। দীর্ঘকাল আলোচনার পর হাকিম আজমল খাঁর গৃহে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য একটা পরামর্শ সভা বসিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে গান্ধীজী প্রস্তাব করিলেন যে, একটি সাব-কমিটি গঠিত হউক। সকলেই তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আজাদ ও হাকিম সাহেব এই তিন জন নেতা সাব-কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইলেন। তাঁহারা বহু পরামর্শ কবিয়া কর্মপদ্ধতিব জন্য একটা খসড়া রচনা কবিলেন। সাব-কমিটির এই খসড়াই অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া-পত্তন। অসহযোগ আন্দোলনের মূলনীতি এই সাব-কমিটি ঠিক করে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অপার সৃজনী ক্ষমতাব সাহায্যে ইহাব বিস্তৃত অংশগুলি যোগ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে মওলানা আজাদের যথেষ্ট

হাত ছিল। পবে এই প্রস্তাব একটি বৃহত্তর কমিটিতে গৃহীত হইবার জন্য উপস্থাপিত হইল। মওলানা আজাদ সকলকে বুঝাইলেন যে, বর্তমানে ইহা ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর পন্থা নাই। পবের দিন ডেপুটেশনের সুদৃশ্যগণ আবার মিলিত হইলেন। মওলানা আজাদ ও গান্ধীজী তাঁহাদের সকলের নিকট প্রস্তাবটির সাব মর্থ বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। লক্ষ্মী ফিবিক্সীমহলের পবলোকগত মওলানা আব্দুল বাবী, মওলানা মহম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলি উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে তখনও মনস্থির কবিতে পাবেন নাই। তাঁহারা বুঝিবার জন্য সময় চাহিলেন। কিন্তু হাকিম আজমল খাঁ মওলানা আজাদকে পূর্ণ সমর্থন করিলেন। এই সময় মিরাতে খেলাফত্ কনফারেন্স হইতেছিল। মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা আজাদ তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে মিরাত বওয়ানা হইলেন এবং এইখানে তাঁহারা মর্কপ্রথম জনসাধারণের নিকট অসহযোগ আন্দোলনের কর্মধারা উপস্থিত কবিলেন। ইহার কিছুদিন পবে ফেবকয়ারী মাসের শেষে কলিকাতায় দ্বিতীয় খিলাফত্ কনফারেন্সের অধিবেশন হইল। মওলানা আজাদ ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে অসহযোগের প্রস্তাবটিকে মুসলমানগণকে গ্রহণ কবিবার জন্য কাতর ভাবে সুপারিশ কবিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই আবেদন ব্যর্থ হইল না। অতঃপর দেশেব নানাস্থানে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু কংগ্রেস এপর্যন্ত নাবব ছিল। অতঃপব কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ও নাগপুরের বাৎসবিক অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত কর্মধারা গৃহীত হইল। এইভাবে দেশেব আবহাওয়া পরিষ্কার হইয়া গেল।

অসহযোগেব বিভিন্ন ধাৰা যথা, ব্যবস্থাপক সভা বয়কট, স্কুল কলেজ বর্জন, খেতাব বর্জন, কোর্ট-আদালৎ বয়কট প্রভৃতি সর্বত্র সভাসমিতির মধ্য দিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। তাবপব যাহা হইল সে ইতিহাস বলিবার মত স্থান এখানে নাই। তাবতেব ঘুমন্ত মানবতা হঠাৎ যাদু কাঠি স্পর্শে জাগিয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম, দেশবন্ধু চিত্তবজ্রন, মওলানা মহম্মদ আলি, শওকত আলি, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লাল লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সমগ্র ভাৰত অসহযোগেব বস্তায় তোলপাড় কবিয়া তুলিলেন। জাতিব জাগরণেৰ এই মহা মুহূর্তে মওলানা আজাদেৰ প্রভাব সর্বত্র বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। মুসলিম উলেমাদেব সাধাবণ সভা ও বিশেষ সভায় সর্বদায়ই তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে হইত। তাবতেব বিভিন্ন প্রদেশেৰ উলেমাদেব প্রতিনিধিগণ লাহোৰে 'একটি উলেমা কনফাৰেন্স আহ্বান কবিলেন। তাঁহাবা অসহযোগ আন্দোলনকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ কবিলেন। এই সভায় আর একটি যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইল তাহা হইতে মওলানা আজাদেব চৰিত্ৰেব বৈশিষ্ট্য বেশ বুঝা যাইবে। উলামাগণ প্রস্তাব কবিলেন যে, অতঃপব মুসলমানদেব নেতাকপে মওলানা আজাদ সাহেবকে "ইমামুল-হিন্দ" অর্থাৎ 'মুসলিম ভাৰতেব একচ্ছত্র নেতা' এই পদে অভিষিক্ত কবা হউক। এক জন আলেমেব পক্ষে এত বড় সম্মানজনক পদ কম শ্লাঘাব বিষয় নহে। কিন্তু মওলানা আজাদ বিনয়েব সহিত এই সম্মানিত পদ প্রত্যাখ্যান কবিলেন। উলামাগণেব অনেকে রক্ষণশীল মত পোষণ কবিতেন। তাঁহাবা মওলানা আজাদেব বহু মত গ্রহণ করেন নাই। তবুও তাঁহাবা মওলানা আজাদকে এই পদ গ্রহণ কৰিবাব জন্য পীড়াপীড়ি কবিতে লাগিলেন।

কিন্তু মওলানা আজাদ কিছুতেই এই সম্মানজনক পদ গ্রহণ কবিত্তে সম্মত হইলেন না। ইহাব কিছুদিন পরেই তিনি গ্রেপ্তার লইলেন। ১৯২৩ সালে তিনি যখন মুক্তি পাইলেন, তখন উলামাগণ আবাব তাঁহাকে “ইমামুল-হিন্দ” পদ গ্রহণ কবিত্তে অস্বরোধ কবিলেন। কিন্তু এবাবও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি ‘জমিয়তে-উলামার’ কার্যকরী সমিতিতে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই পদ সৃষ্টি করিলে পবে নানা অস্ববিধাব উৎপত্তি হইতে পাবে, এমন কি মুসলমানের মধ্যে ব্যক্তি-পূজা আবন্ত হইতে পাবে। একজন ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিত তিনি হউন না কেন—তাঁহাকে এই তাবে সম্মানিত করিলে পরে এই পদ উত্তবাধিকারের মত একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া যাইবে, এবং হয়ত অযোগ্য লোক উহার অধিকারী হইয়া জাতির উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি কবিত্তে পাবে। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ত্যাগ অসাধারণ ত্যাগ। তাঁহার এই ত্যাগ-নিষ্ঠা উলামাদের নিকট তথা দেশ-বাসীর নিকট তাঁহার সম্মান বহু গুণে বাড়াইয়া দিল। মওলানা যে খাটি গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাস করেন ইহা তাহাবই একটি প্রমাণ।

অসহযোগ আন্দোলনের কয়েক বৎসব ভাবতের ইতিহাস এক মহা গৌরবের যুগ। প্রত্যেক ভাবতবাসী আজিও গর্বেব সহিত, আনন্দের সহিত এই যুগের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। এই যুগে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত তাবে সর্বপ্রথম বুঝিল যে, একতাই তাহাদের শক্তি; সংহতিই তাহাদের প্রেরণা, প্রেমই তাহাদের বন্ধন। এই একতা, সংহতি ও প্রেম থাকিলে তাহারা স্বাধীন হইতে বাধ্য। তদ্ব্যতীত তাহাদের চলিবে না, চলিতে পারে না। জালিনওয়ালাবাগের রুধিরাক্ত প্রাঙ্গনে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান

শিখকে যে একতা বন্ধনে আবদ্ধ কবিয়াছিল, তাহা সত্যিকারের বন্ধন। মহাত্মা গান্ধী, মণ্ডলানা আবুল কালাম, মণ্ডলানা মহম্মদ আলি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতির অপার প্রভাব দেশে একটা অভূতপূর্ব পবিত্রত্ব আনয়ন করিল। মুসলমান বুঝিল যে, রাজনীতিতে বৈবাগ্যে তাহাদের লাভ নাই। হিন্দু বুঝিল, তাহাদের এত দিনেব সাধনা সিদ্ধিনাভ করিতে চলিয়াছে। চারিদিকে উত্তেজনা, উদ্দীপনা, সভাসমিতি। সরকার এ দৃশ্য নীরবে দেখিতে পারিলেন না। তাঁহারা ধড়পাকড আরম্ভ করিলেন। এই সময় গণজাগরণ এরূপ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, সরকার উহাতে ভীত হইয়া পড়িলেন। ধরপাকডে তাঁহারা ইহা বন্ধ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তবুও দমন-নীতি বন্ধ হইল না। সকল বড় বড় নেতা হাসিতে হাসিতে জেলে গেলেন। আলি-ভ্রাতৃদ্বয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি কাবাগাবে রুদ্ধ হইলেন। এই সময় তদানীন্তন বড় লার্ড লর্ড বিডিং গবর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপোষের প্রস্তাব করিলেন, এবং এই ইচ্ছা জানাইলেন যে, একটি গোলটেবিল বৈঠক দ্বারা কংগ্রেসের প্রস্তাব আলোচনা করিবেন। কিন্তু গান্ধীজী দৃঢ় ভাবে জানাইয়া দিলেন যে, আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভব হইবে না। কিন্তু সরকার বিনা সর্ত্তে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে সম্মত হইলেন না। ইহাব কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের যুবরাজের ভাবত পরিদর্শনের কথা ঘোষিত হইল। সরকার চাহিয়াছিলেন যেন এজ্ঞা কোনরূপ বয়কট আন্দোলন না হয়। কিন্তু গান্ধীজী আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনা সর্ত্তে মুক্তি ব্যতীত সরকারের সহিত কোনরূপ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলেন না। সরকারও ছাড়িবাব পাত্র

নহেন। তাঁহারা কঠোর ভাবে দমননীতি চালাইতে লাগিলেন। এবং তাহার ফলে একে একে বহু নেতা গ্রেপ্তার হইতে লাগিলেন। মওলানা আবুল কালাম, লালা লাজপত বায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সত্যচন্দ্র সকলেই গ্রেপ্তার হইলেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবাব আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ চৌরীচেবাব লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে তিনি এত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন যে, তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ কবিতা দিলেন। ইহার কিছুদিন পর তিনিও গ্রেপ্তার হইলেন। বড় বড় নেতারা কাবাগাবে। তত্পরি হঠাৎ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত। সর্বশেষে মহাত্মাজীব গ্রেপ্তার—এই তিন ঘটনা দেশেব মধ্যে একটা অবসাদ ও জড়তা আনিয়া দিল। কাবাগারের বাহিবে যাঁহা ছিলেন, তাঁহারা জনসাধারণেব মধ্যে আব অশুভপ্রেরণা জাগাইতে পাবিলেন না। তাঁহাদের গঠনমূলক কার্যের আবেদন ব্যর্থ হইল। সমগ্র দেশে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কোন যুদ্ধরত সেনাপতির গ্রেপ্তারে স্থগিষ্ঠিত সৈন্তদলেব মধ্যে ষেক্রপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সেই সময়ে দেশেব অবস্থাও সেইরূপ হইল। অসহযোগ আন্দোলনেব সূচনা হইতে যে সব সাম্প্রদায়িক নেতা জাতীয় জাগরণের শুভক্ষেণে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাৰা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের হত গৌরব ফিরিয়া পাইবার এই অবসর। তাঁহাৰা ধীরে ধীরে নানা মূৰ্ত্তিতে, নানা ছলছুতা ধবিয়া আসরে নামিতে লাগিলেন। যে তৃতীয়পক্ষ তীত চকিত চিত্তে দেশের এই জাগরণ নিরীক্ষণ কবিতেছিল, তাহাৰা এসব সাম্প্রদায়িক নেতাদেরকে যথাসময়ে কাজে লাগাইয়া দিল। এতদিন

যে ‘divide and rule’ পলিসি অচল হইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার ক্ষেত্র পাইয়া জাঁকিয়া বসিল। সরকারের এই ভেদনীতি ১৯১৯ হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইতেছিল। অসহযোগ আন্দোলন মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাই আবার সক্রিয় হইয়া উঠিল। সংশ্লিষ্ট দলগুলি, স্বার্থপর নেতাগুলি এবং অদূর্বদর্শী উপনেতাগণ অল্প লোকের সবল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে আবৃত্ত কবিল। আমরা কেবল সবকারকে দোষ দিয়া কর্তব্য শেষ করিতে চাই। কিন্তু তাহা একতরফা অভিযোগ। আমাদের নিজেদের দোষেরও সীমা নাই। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেন এই ভেদনীতিব দাস হইয়া পড়েন? কেন আমরা লোকদিগকে সাবধান কবিয়া দিই না? পরাধীন দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, বিদেশী শক্তি অপেক্ষা দেশের লোকই স্বাধীনতার পক্ষে অধিকতর কণ্টক সৃষ্টি করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসের নেতাদের কাবাগমনের পর সরকারের ভেদনীতি সফল হইয়াছে। ইহাব পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করিতেছে যে, ইতিপূর্বে আমাদের যে একতা হইয়াছিল, তাহা অস্থায়ী—যে জাগরণ হইয়াছিল তাহা মাতালের মত্ততা মাত্র,—মদিরাময় আবশ্যমাত্র। ইহা হৃদয়ের একতা ছিল না, প্রাণে প্রাণে মিলন ছিল না। স্বতবাং গোবধ ও বাতুলতাও প্রশ্নে আবার আমাদের আদিম পৈশাচিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। এই সময় “give and take” অর্থাৎ লেনদেনের বাস্তব নীতি সকল প্রকার গণ্ডগোল মিটাইতে পাবিত। কিন্তু কেহ সে নীতি-কথা শ্রবণ করিল না। কারণ সাম্প্রদায়িক নেতাগণ ইতিমধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্র অধিকার কবিয়া বসিল। উদাৰতা, সহিষ্ণুতা, অপরের দরদ বুঝিবার প্রশস্ত হৃদয়—এইগুলির ছিল

বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নেতৃগণ সে প্রয়োজন মিটাইতে পারিলেন না। তাঁহাবা ধরিলেন অন্য পথ। জনসাধারণের মন হইতে এই সমুদয় মহৎ গুণ দূর করিয়া তথায় অমুদারতা, সঙ্কীর্ণতা ও জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য তাঁহাবা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। নানাবিধ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটয়া ১৯১৯-১৯২২ সালের সমস্ত সাধনাকে ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইল। সে ভ্রাতৃত্ব, সে একপ্রাণতা, সে এক জাতীয়তা—সব দূর হইয়া গেল। অহিংসার প্রতি ভাসা ভাসা আগ্রহ দূর হইয়া গেল। বাহু বল ব্যতীত জনসাধারণের নিকট অন্য কোন আবেদন কার্যকরী হইল না।

দেশের এই দারুণ দুর্দিনে অনেক কংগ্রেসী নেতা তাল হাবাইয়া গেলেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহু নেতা জাতীয়তাবাদ আদর্শে পদাঘাত করিয়া সাম্প্রদায়িক দলে যোগ দিলেন। কিন্তু মওলানা আজাদ ঐ দুর্দিনেও আদর্শ হইতে একটুকুও বিচ্যুত হইলেন না। তিনি “আল্ হেলালেব” আদর্শে দৃঢ় থাকিয়া সকল ঝটিকা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইলেন। চাষিদিগকে সাম্প্রদায়িক অগ্নি জলিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন প্রদেশে অসন্তোষের কারণ নিছক অর্থনৈতিক। হয়ত কোন মন্ত্রী অথবা উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তাঁহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে কোন একটা চাকরী প্রদান করিয়াছেন, অথবা নিজের স্বধর্মের কোন ব্যক্তিকে একটুকু স্থানজরে দেখিয়াছেন, আব অমনি অন্য সম্প্রদায়ের মনে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বহি জলিয়া উঠিল। দেশের এইরূপ অশান্তিময় দিনে এই মনোভাব আবও গুরুতর আকার ধারণ করিল। হয়ত কোথায় ঋণ ভারগ্রস্ত দরিদ্র মুসলমান অর্থশালী হিন্দু জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে কথিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাঙ্কগণ ইহাকে ‘ইশু’ করিয়া চাষিদিগকে

দাবানল জ্বালাইয়া দিল। প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের চাইগণ বিনা কারণে, অথবা সামান্য কারণে অপবেব ধর্ম্মানুভূতিতে আঘাত করিয়া দেশময় অসন্তোষ বিস্তার করিল। হৃদয় পরিবর্তন না কবিয়া, কেবলমাত্র সংখ্যা বাড়াইবার জন্ত ছলে বলে কৌশলে একদল অপরকে নিজ নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত পুঁবাদমে প্রচাব কাষ্য চালাইতে লাগিল। মুসলমানগণ “তবলিগের” দাবী কবিয়া হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষা দিতে লাগিল। আর হিন্দুগণও “ভুক্তির” দাবী কবিয়া দীক্ষিত মুসলমানকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে আনয়ন করিবাব চেষ্টা কবিতে লাগিল। ইহা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপাব। এ অধিকার সকলেরই সকল সময় আছে। কিন্তু যেখানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্রোষে পূর্ণ হইয়া আছে, সেখানে এই ধবর্ণের অধিকাব লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে বাধ্য, স্মৃতবাং অবিলম্বে দেশেব নানা স্থানে এক দলের সহিত অপর দলের সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। নানা স্থানে বীভৎস আকাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া গেল। বিভিন্ন দলের সংবাদপত্র চূপ কবিয়া বহিল না—তাহারা অনেকেই ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক নেতারা বেনামীতে বহু ইশতেহার বিলি কবিয়া এই অনলে ফুৎকাব দিতে লাগিলেন। কিছুদিন অপ্রতিহত গতিতে এই সব চলিল। অতঃপর কংগ্রেসেব নেতারা একে একে কারাগার হইতে বাহির হইলেন। তাঁহারা বাহির হইয়া সমগ্র দেশকে এই অবস্থায় পতিত দেখিলেন। তাঁহারা অশ্রুপূত নয়নে দেখিলেন যে, তাঁহাদের এত দিনের প্রাণপাত সাধনা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, পবিত্র স্থানের অবমাননা, নবহত্যা, নারী হরণ—এই সব যখন অপ্রতিহত ভাবে চলিয়াছে—ঠিক সেই সময় মহাত্মা গান্ধী কারাগার হইতে বাহিরে আসিলেন।

সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দু ও মুসলমান গান্ধীজীকে চাপিয়া ধরিল—
 তুমি আমাদের সর্বনাশ করিয়াছ। হিন্দু বলিল : “তুমি মুসলমানকে
 অশ্রদ্ধা, প্রত্যাখ্যান দিয়াছ। তুমি মুসলমানের খেলাফতের পক্ষ হইয়া তাহাদের
 অভিযোগের সহিত আমাদেরকে মিলিত করিয়া তাহাদের বাড়ি বাড়ি গিয়া
 দিয়াছ। তাহারা ধর্মের নামে একতাবদ্ধ হইতে চলিয়াছে,—তাহারা
 জাগিয়াছে। আর এখন খেলাফতের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাওয়ার পূর্বে
 জাগরিত মুসলমান হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে।” অত্যাচারকে
 মুসলমান বলিল : “তুমি আমাদের সর্বনাশ করিয়াছ। আমরা সবল
 প্রকৃতির লোক, আমাদেরকে ভুলাইয়া বিপথে লইয়া গিয়াছ। আমাদের
 প্রতি তোমার স্বজাতিবাদের অত্যাচার ব্যবহার করিয়াছ। তুমি আন্দোলন
 করিয়া আজাদ, মহম্মদ আলি, শওকত আলিকে হাত করিয়া লইয়াছ।
 তুমি তাহাদের সাহায্যে সাব সৈয়দ আহমদের সাধের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে
 আক্রমণ করিয়াছ। তুমি ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করিতে বলিয়া আমাদের
 সুযোগ্য লোককে সেখানে বাইতে দাও নাই। তাহাতে আমাদের চরম
 ক্ষতি হইয়াছে।” গান্ধীজী ধীরভাবে এই সকল অভিযোগের উত্তর
 দিলেন। কিন্তু কে শুনে কাহার কথা? অতঃপর তিনি হিন্দু-মুসলিম
 বিবাদের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ঘোষণা করিলেন :
 “আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য একটুমাত্র অক্ষুণ্ণ নহি। যদি আমি
 ভবিষ্যৎদর্শী হইতাম এবং সাম্প্রদায়িক কলহের জন্য যাহা ঘটিয়াছে তাহা
 যদি পূর্বাঙ্কে সমস্তই অবগত হইতাম, তবুও আমি খেলাফতের প্রসঙ্গে
 অকুণ্ঠিত চিন্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। জনসাধারণের জাগরণ আমার শিক্ষার

একটা প্রধান অংশ। ইহাই আমাব চব্বয় লাভ। আমি জনসাধারণকে পুনরায় ঘুম পাড়াইবার কিছুই করিব না।” এই প্রবন্ধ প্রকাশের কিছুদিন পরে কোহাটে একটা ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইল। তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক নিহত হইল, এবং বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইল। এই নিদারুণ ঘটনায় গান্ধীজী মর্মান্তিক যাতনা অনুভব করিলেন। তিনি ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কবিত্তে মনস্থ করিলেন। ১৯২৪ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর তাবিথে তিনি ঘোষণা করিলেন : “লোকে না জানিয়া যে পাপ কবিয়াছে তাহাদের হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কবিব। আমি বক্তান্ত হৃদয়ে একুশ দিন উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত কবিব।” তাঁহাব এই সঙ্কল্পে দেশের চাবিদিকে বিষাদেব ঘন ছায়াপাত হইল। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য বহু গণ্যমান্য নেতা দিল্লীতে আগমন করিলেন। তাঁহাবা একটি ঐক্য-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। এই ঐক্য-সম্মিলনী স্থির কবিল—দেশের সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটি সর্ববাদী-সম্মত সমাধান আবিষ্কার করিবেন। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়েব প্রায় দেড়শত জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার কাজ কয়েকদিন ধরিয়া চলিল। কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হইল। কিন্তু ইহা সাম্প্রদায়িকতা প্রাবিত দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কারণ সভার কতকগুলি সদস্য প্রস্তাব ও পান্টা প্রস্তাব দ্বারা সভার শাস্ত বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, অনেকগুলি প্রয়োজনীয় সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে চাহিয়াছিলেন। ছিল না সেখানে

বাণী। তাঁহার সেদিনকার বক্তৃতা নিম্নদেহভাবে প্রমাণ করিল যে, তিনি ভাবতের মধ্যে একজন বিশিষ্ট শ্রেণীব বক্তা। তাঁহার সে বক্তৃতায় যুক্তি, উদারতা, ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও বাগ্মীতা পবিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মুসলমানদেরকে উপলক্ষ্য করিয়া যে আবেদন করিলেন তাহাতে এই সভার মোড় ফিবিয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে বলিলেন যে, গোবধ,—কি খাইবার জন্ত, কি কোরবানীর জন্ত—ইসলাম ধর্মের মৌলিক অঙ্গ নহে। তিনি হিন্দুদেরকে বলিলেন যে, দেশ হইতে গোবধ একেবারে বন্ধ হওয়া সম্ভব নহে। তিনি আবও বলিলেন যে, এমন বন্ধ মুসলমান আছে যাহারা গোমাংস খায় না, এবং তাহারা মুসলমানদের মধ্য হইতে ইহা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার আবেদনে মুসলমান প্রতিনিধিগণ বিচলিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রস্তাবের শেষ অংশটি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। সভাপতি সভার কাজ মূলতবো রাখিলেন, এবং যাহাতে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের পরামর্শ করিয়া যাহা হয় একটা কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। কিছুক্ষণের জন্ত সমস্ত আবহাওয়াটি মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল। অবশেষে মওলানা আজাদের আবেদন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের হৃদয়দেশে অভিভূত করিয়া দিল। তিনি সভার এই দুর্ব্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন : “হিন্দুগণ গোবধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করাব অংশটির উপর আর জোর দিবে না। তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।” সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহের মধ্যে একটা তুণ্ড হর্ষধ্বনি উখিত হইল। সভার পরবর্তী কাজ সহজতর হইয়া আসিল। এতক্ষণ ধরিয়া অধিকারের প্রশ্ন লইয়া যে

বাদামুবাদ হইতেছিল, এইবার বুঝা গেল দায়িত্ব পালন না করিলে সে অধিকারের কোন মূল্য নাই।

ইহার পব মহাত্মা গান্ধী একুশ দিন ব্যাপী উপবাস ভঙ্গ করিলেন। বহু মুসলিম নেতা তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন। ঐক্য-সম্মিলনীর সাফল্যে প্রীত হইয়া তিনি দুর্বল কণ্ঠে বলিলেন, “ভগবানের ইচ্ছা যে কি তাহা আমি জানি না। আজিকার দিনে অনুবোধ করি—আপনারা শপথ গ্রহণ করুন যে, আমরা হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের জন্ত প্রাণপাত করিব।” হাকিম আজমল খাঁ ও মওলানা আজাদ বলিলেন, “আমরা প্রস্তুত আছি।” হায়। আজ হাকিম সাহেব আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু মওলানা আজাদ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনের জন্ত প্রাণপাত করিতেছেন। উভয় সম্প্রদায়কে এক করিবার জন্ত সেতুস্বরূপ ষাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, আজ সারা ভাবতে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। মওলানা আজাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সব অকাতবে সহ্য করিয়া মৈত্রীব বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্ত তিনি আজিও পর্বতের মত অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু হায়। গান্ধীজীর উপবাস, ঐক্য সম্মিলনীর প্রয়াস—সবই বুঝি ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। আজিও সে বিবাদের পবিসমাপ্তি হয় নাই। আজ তাহা অধিকতর মাবাজুক আকার ধারণ করিয়া দেশকে পশ্চাতের দিকে লইয়া বাইতেছে। ইহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আজাদ, চিত্তবঞ্জন দাশ, জগদ্বাহরলাল নেহরু, স্বভাষচন্দ্র যে আদর্শের প্রতীক তাহা সহজে ব্যর্থ হইবে না, এই আমাদের একান্ত ভরসা।

ইহার পব কিছুদিন মওলানা আজাদ নীচবে আত্মসন্ধান করিতে

ঐক্যমত নাই বা হইল, কিন্তু তাই বলিয়া বাগড়া ও কথা-কাটাকাটি কবিয়া লাত নাই। তিনি নিজের কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন না। দুই দলের মধ্যে কাজের একটা যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব কি না, তাহা লইয়া বহু নেতার সহিত আলোচনা করিলেন। এই ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি প্রাণপণে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কোন পক্ষে যোগ না দেওয়াতে তিনি দুই দলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার শক্তিতে চব্বিশ বিশ্বাসী ছিলেন। উভয় দলের আশ্বাস পাইয়া তিনি সর্বাসত্ত্বকরণ দিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলোচনা কবিবার জন্য কখন কখন তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইয়াছিল। উক্ত দুই দল ব্যতীত আর একটি দল ছিল জমিয়তুল-উলামা। এই দল প্রথমে ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল প্রকার সহযোগতা করা পাপ। তাঁহারা আবার সেই সরকারের অধীনস্থ আইন-সভাতে যোগ দিবার পক্ষে মত দিতে স্বীকৃত হইলেন না। আলেমদের প্রভাবশালী নেতারা ঘোষণা করিলেন যে, যাহা শয়তানী শাসকবর্গের সৃষ্টি, সেখানে তাঁহারা দেশকর্মীগণকে আসন লইতে অনুমতি দিতে পাবেন না। এই আলেম সম্প্রদায় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তাঁহাদের উক্ত বিশ্বাস পাস করাইয়া লইলেন। মনে হইল এই ধর্মীয় বাধা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত উক্ত দুই দলের মধ্যে কোন আপোষ হইতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেসের অন্য দল পরিবর্তনের প্রচণ্ড সমর্থক ছিলেন। এই দুই দলের মতপার্থক্য বিরোধে পবিণত হইতে চলিল। দল ছাড়াছাড়ি হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু এই দুঃসময়ে মওলানা আজাদ উভয় দলকে বিচ্ছেদের হাত হইতে

অসহযোগ আন্দোলনের যুগ ৫৯

রক্ষা করিলেন। তাঁহাব ঘৃণিকৃত্যতা, বাগ্মীতা, ও dialectical পদ্ধতির অপূর্ব কৌশলে এযাত্রা কংগ্রেসকে দ্বিধা বিভক্ত হইতে দিলেন না।

এই সমস্তাব সমাধানের জন্ত কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন হইল। মওলানা আজাদই ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৯২৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহাব সভাপতিত্বে দীর্ঘিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। তাঁহাব অভিভাষণে তিনি আপোষের একটি 'ফবমুলা' উপস্থিত করিলেন : "যাঁহাবা আইন-সভায় প্রবেশ করিবার নীতিতে বিশ্বাসী তাঁহাবা সে অধিকার পাইবেন। তাঁহাদের কর্তব্য হইবে—তাঁহারা যেন আইনসভা অধিকার করিয়া তিতব হইতে বাধা দিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহাবা এই প্রোগ্রামে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাবাও কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য করিতে থাকিবেন। মওলানা আজাদের এই 'ফবমুলা' সকলেই সম্বলিত চিন্তে গ্রহণ করিল। এই সময় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম পার্লামেন্টারী প্রোগ্রাম বচিত হইল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মওলানা আজাদ অতুলনীয় সূক্ষ্ম বাজনীতিজ্ঞান ও বাস্তবদৃষ্টিব পবিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অভিভাষণের মধ্যে ঘোষণা করিলেন : আমি জানি যে, আইন-সভায় প্রবেশের প্রোগ্রাম আনাদিগকে অধিক দূর্ব লইয়া যাইবে না। আমার দৃষ্টি সব সময় ভবিষ্যতের উপর নিবদ্ধ। একদল প্রভাবশীল কংগ্রেসনেতা ও কর্মীর মধ্যে পার্লামেন্টারী মনোবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছে। আমার মনে হয়, সাফাৎ কর্ম পবিকল্পনাব (direct action) অন্ত কোন প্রোগ্রাম উপস্থিত না থাকাতে এই পদ্ধতিব সাহায্যে কিছু কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া সম্ভব।" উক্ত অধিবেশনে আইনসভায় প্রবেশের অধিকার, না দিলে

কংগ্রেসের অবস্থা কি দাঁড়াইত, ভাল হইত কি মন্দ হইত, আজ তাহা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু মওলানা আজাদের ফবমূল। কংগ্রেসের একটা মস্ত উপকার কবিল। তাহা এই যে, উহা কংগ্রেসকে দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইতে বাধা দিয়াছে। দুই দলে বিভক্ত হইলে জনসাধারণের মধ্যে একটা গভীর অবসাদ আসিত। পরবর্তী যুগে কংগ্রেসকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারী প্রোগ্রাম গ্রহণ কবিতে হইয়াছে। কংগ্রেস নেতাগণ উক্ত প্রোগ্রাম হইতে যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াছেন। ইহা অস্বীকার করা যায় না।

ইহাব কিছুদিন পর ব্রিটিশ সরকার তাবতবর্ষকে অধিকতর রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর কবিবার ইচ্ছা ঘোষণা কবেন। কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রভাবেই যে তাহাদের মনোবৃত্তি কিছু পরিবর্তন হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ব্রিটিশ সরকার স্থির কবিলেন যে, শ্রাব জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি বাজ্জকীয় কমিশন ভারতে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাবতের কাহাকেও এই সাইমন কমিশনে স্থান দিলেন না। ইংলণ্ডের সাতজন লোক লইয়া শ্রাব জন সাইমন কমিশন ভারতে পদার্পণ কবিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের ভাগ্যানিয়ন্ত্রণের জন্ত এই কমিশন আসিল, তাহাদের কোন প্রতিনিধি সেখানে রহিলেন না। ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্ম-সম্মানে আঘাত করিল। সেই জন্ত দেশের সর্ব্বশ্রেণীর জননেতা সাইমন কমিশনকে বয়কট কবিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজকে বয়কট করার মতই এই বয়কট সফল হইয়াছিল। কতকগুলি নবাব-সুবা, সরকার-পূজক মডারেট ব্যতীত আর কেহই ইহাকে কোনওরূপ

সাহায্য কবে নাই। ব্রিটিশ সরকারেব এই আচরণ আইন-সভায় প্রবেশ-পন্থী কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুও আইন-সভা প্রবেশেব মোহ বহু পূর্বে কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি এক্ষণে সাক্ষাৎ সংগ্রাম কবিবাব জ্ঞাত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসেব বাৎসরিক অধিবেশনে ব্রিটেনকে এই মর্মে একটা চব্বম পত্র দেওয়া হইল যে, এক বৎসরের মধ্যে ভাবতবর্ষকে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস দেওয়া হউক। ১৯২৯ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করিল যে, সমস্ত কংগ্রেস সদস্যগণকে বিভিন্ন আইন সভা হইতে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। পর বৎসর কংগ্রেসেব লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু কেবল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামমূলক কর্মপন্থিক্রমা গ্রহণ কবা দাবকার। তাই গান্ধীজীব নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের মূল নীতি গৃহীত হইল। লাহোর অধিবেশনেব সভাপতি পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু একটি আবেগপূর্ণ আবেদন দ্বারা দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা কবিলেন : “পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।” কংগ্রেসের এই অধিবেশনেব পর হইতে আইন অমান্য আন্দোলনেব বাণী চারিদিকে জ্বলন্ত আগ্রারের মত ছড়াইয়া পড়িল। সমগ্র দেশ একটা মহা সংগ্রামেব সম্মুখে উপস্থিত হইল।

এই মহা পরীক্ষার সময় মুসলমানগণ কোথায় গেল? যাহারা হাজারে হাজারে খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? সত্য বটে, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বহু মুসলমান উহাতে

যোগ দিয়াছিল, এবং প্রায় চৌদ্দ হাজার মুসলমান কাবাবরণ কবিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদেব অনেকেই পিছাইয়া পড়িয়াছিল। ১৯২৪ সাল হইতে আলি জাভেদ ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে সবিয়া পড়িতেছিলেন। যদিও তাঁহারা লাহোর অধিবেশনে যোগদান কবিয়াছিলেন, তবুও তাহাতে কোন অংশ গ্রহণ কবেন নাই। তাঁহারা ববং গান্ধীজীকে এই বলিয়া সাবধান কবিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসেব আইন অমান্য অভিযানে মুসলমানগণেব সহযোগিতা ব্যতীত কংগ্রেসেব পক্ষে আইন অমান্য সংগ্রাম ঘোষণা করা মহা ক্ষতিব কাৰণ হইবে। ডাক্তার আনসারী ববাববই কংগ্রেসেব পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি আইন অমান্যেব ব্যাপাবে খুব উৎসাহ দেখান নাই। মওলানা হুমায়ূন মোহানী, মওলানা জাফর আলি প্রমুখ কংগ্রেস-ভাবাপন্ন নেতাগণ আইন অমান্য আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন কবেন নাই। তাঁহাদেব এক্ষণে মনোভাবেব একটা গূঢ় কারণ ছিল। ডাক্তার আনসারী ব্যতীত উপবোক্ত নেতাগণ কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন খেলাফত উদ্ধাবেব জন্ত, এবং সেজন্ত প্রাণ বলিদান করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কামাল পাশা কর্তৃক খেলাফত পদ উৎখাত করাব পর খিলাফত সমস্তার আব কোন গুরুত্বই রহিল না। সুতরাং তাঁহারা কিসেব জন্ত শুধু শুধু প্রাণ দিতে যাইবেন? তাই তাঁহারা ধীরে ধীরে কংগ্রেস হইতে সবিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে মওলানা আজাদেব আদর্শ ছিল অন্য ধরনের। তিনি দেশেব স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম কবিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে যোগদান কবিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট খিলাফত ছিল পরোক্ষ উদ্দেশ্য। সকলেই সবিয়া গেলেও তিনি স্বদৃঢ় মুষ্টিতে কংগ্রেসেব পতাকা ধরিয়া রহিলেন। আইন অমান্য

আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে তাঁহাব মনে সামান্য মাত্র সন্দেহ জাগে নাই। তিনি কংগ্রেসেব আদর্শেব সফলতার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাব এতটুকুও সন্দেহ ছিল না যে, মুসলিম জনসাধারণ কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিবে না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কোন ফল হইবে না। পববর্তী ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, তাঁহাব কথাই ঠিক। যেখানেই মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস সেবিগণ প্রবেশ করিয়াছে, সেইখানেই কংগ্রেস সফলতা অর্জন করিয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসেব বাগী হুদূর পল্লী-গ্রামে প্রচারিত হইয়াছে। আইন অমান্য সংগ্রামের সময় এই প্রদেশের কয়েক সহস্র মুসলমান কাবাবরণ করিয়াছে এবং অশেষ প্রকার নির্ধ্যাতন সহ্য করিয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের অন্ততম অস্থায়ী ডিক্টেটাব হিসাবে মওলানা আজাদকে কাবাবরণ করিতে হইয়াছিল। কাবাগাবে যাইবার কালে তিনি ডাঃ আনসারীকে তাঁহাব স্থলাভিষিক্ত করিলেন। ডাঃ আনসারী এই পদ পূরণ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। ১৯২১ সালের মতই ১৯৩০ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরাট সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল। লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া যে সত্যগ্রহ সংগ্রাম আবস্ত হইল, তাহা নানা শাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলিল। দেশেব সর্ব শ্রেণীর মধ্যে যে জাগরণ দেখা দিল, তাহা অপূর্ব ও অচিস্তানীয়। এই সংগ্রামে মওলানা আজাদ তাঁহাব সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন যখন পূর্ণোন্মুখে চলিতেছিল, তখন ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত একটা বুঝাপড়া করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। বহু

আলোচনার পর মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড় লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে একটা চুক্তি হইল। তদনুসারে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের হইয়া যোগদান কবিত্তে বিলাত গমন করিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর বিলাত গমনের পূর্বে কংগ্রেস আবাব মাইনরিটি সমস্তা সম্বন্ধে তাহাব নীতি ঘোষণা কবিল। আর এই নীতি প্রণয়নে মওলানা আজাদের প্রেবণা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। কংগ্রেস ঘোষণা কবিল : “কংগ্রেস মনে কবে যে, কেবল জাতীয় পন্থাতেই সাম্প্রদায়িক সমস্তাব সমাধান হইবে। কংগ্রেস হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও অন্যান্য মাইনরিটি সম্প্রদায়কে এই আশ্বাস দিতেছে যে, পববর্তী যে কোন শাসনতন্ত্রে যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গণকে নিরাপত্তাব পূর্ণ প্রতিশ্রুতি না দেয় এবং যদি সকল সম্প্রদায়কে তাহা সন্তোষ দিতে না পাবে, তবে কংগ্রেস তাহা স্বীকাব করিবে না। দেশের বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কংগ্রেস একটা সাময়িক সিদ্ধান্ত রচনা করিতেছে, তাহা অবিমিশ্র জাতীয়তা ও অবিমিশ্র সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা আপোষবফা মাত্র।” কংগ্রেসেব এই প্রস্তাব মুসলিম লীগেব চৌদ্দ দফার ক্ষতিকর বহু দাবী স্বীকাব করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক সমস্তা সম্বন্ধে কংগ্রেসের একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান কবিলেন। তিনি ডাক্তাব আনসারীকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেব প্রতিনিধি হিসাবে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাদেব অন্তায় জেদের জন্ত তাঁহাকে সঙ্গে লইতে পারেন নাই। গান্ধীজীব সাম্প্রদায়িক মিলনেব সকল প্রকার উত্তম কি ভাবে ব্যর্থ হইল সরকার নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিয়া কেমনভাবে গোলটেবিল বৈঠকেব সমস্ত

আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন, সে সব বিষয় আমাদের আলোচনার বাহিবে। বস্তুতঃ গোলটেবিল বৈঠকে ইংরাজ বণিকদের প্রতিনিধিগণ এই সম্পর্কে যাহা কবিয়াছেন তাহা সমগ্র ব্রিটিশ জাতির সততাব উপর কলঙ্ক-বেথাপাত করিবে। বহু যুগ ধবিয়া যে ভেদনীতি ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শাসনের প্রধান নীতি ছিল, গোলটেবিল বৈঠকে তাহাকেই তাঁহাবা সর্ব প্রকারেই কাজে লাগাইয়াছিলেন। উহার ফলাফলের কথা চিন্তা করিয়া ব্রিটিশ বণিকদের প্রতিনিধি বেনথাল সাহেব আনন্দে বিভোর হইয়া বলিতেছেন :—

“মিঃ গান্ধী বিস্তৃত হস্তে ভাবতে ফিবিয়া আসিলেন। সাধারণ নির্বাচনের পর সরকারের দক্ষিণ পন্থীগণ স্থির করিল যে, কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, এবং গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের সহিত সংগ্রাম করিবে। মুসলমানগণ ইউরোপীয়ানদের স্বদৃঢ় বন্ধু হইয়াছেন। মুসলমানগণ তাহাদের সুবিধাব জন্ত পবম সন্তুষ্ট হইয়াছে, এবং আমাদের সহিত একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। মুসলমানগণ ঠিকই আছে। মাইনরিটিদের প্যাক্ট ও ইহার প্রতি সবকারের বন্ধুতাব আমাদের ইহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আশ্বাস দিতেছে।” এইভাবে বাজন্যবর্গ ও মাইনরিটিগণ দেশের সাধারণ স্বার্থে জলাঞ্জলী দিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্ত দেশদ্রোহিতা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সত্য সত্যই গান্ধীজীকে বিস্তৃত হস্তে ফিবিয়া আসিতে হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য কবি, ইহাতে কাহাব উপকার হইয়াছে? ইহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনই দৃঢ় হইয়াছে এবং মুসলমান বা অন্যান্য মাইনরিটিদের কোন উপকার হয় নাই।

এই সব ঘটনা হইতে মওলানা আজাদের সাম্প্রদায়িক সমস্তা সম্পর্কে

মনোভাব লক্ষ্য করা দরকার। তিনি কোনও দিন স্বীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। মুসলমানদের সুবিধার নামে তিনি কোনও দিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষভুক্ত হন নাই। কিছু দিন পবে ডাক্তার আনসারী পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন শ্রেষ্ঠতম জাতীয়তাবাদী মুসলমান ভারতের রাজনীতি হইতে অপসারিত হইলেন। মওলানা আজাদ তাঁহার মৃত্যুতে বড়ই নিঃসঙ্গ অনুভব করিলেন। অবশ্য আর কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু ডাঃ আনসারীর অভাব তাঁহারা পূরণ করিতে পারিলেন না। সাম্প্রদায়িক নেতাগণ মুসলমান সমাজকে যতই জাতীয় সংগ্রাম হইতে তাক্কাইয়া আনিতে লাগিল, ততই মওলানা আজাদের জাতীয় আদর্শের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল। তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে, প্যাক্ট ও আপোষ-বফাব দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হইবে না। তিনি বুঝিলেন যে, তাবতবর্ষ যাবৎ ব্রিটিশের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইবে, তাবৎ সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনও রূপ সমাধান হইবে না। হিন্দু ও মুসলমান ঐ দুই সম্প্রদায়কে তাহাদের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিলেই তাহারা নিজেদের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া লইবে।

পরবর্তী ঘটনা অতি সংক্ষেপে বলিব। মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, দ্বিতীয় সত্যগ্রহ সংগ্রাম, লর্ড ওয়েলিংটনের পীড়নমূলক শাসন, গান্ধীজী ও মওলানা আজাদের কারাবরণ, সহস্র সহস্র স্বৈচ্ছাসেবকদের আত্ম বলিদান, সত্যগ্রহ প্রত্যাহার—এইভাবে বহু ঘটনা দুই বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। দেখিতে মাত্র দু'এক

বংসর ; কিন্তু ভারতের ইতিহাসে ইহা নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছে । এই সব যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যে মণ্ডলানা আজাদ চব্বম কংগ্রেস-সেবী হইয়া রহিলেন । অনমনীয় দৃঢ়তা লইয়া ও মুসলমান সমাজের নিন্দাগ্রানি সহ কবিয়া তিনি নবযুগ সৃষ্টি করিতে আত্ম নিয়োগ করিলেন ।

গঠনমূলক কার্য

১৯৩৫ সালের ভাবত আইন ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত কবিয়াছে। কিন্তু তাহা নামেই স্বায়ত্তশাসন। ইহা ক্ষমতার সাব অংশ দেশেব প্রতিনিধিদেব হস্তে ছাড়িয়া দেয় নাই। গবর্ণবগণই সকল বিষয়েব চবম প্রভু হইয়া রহিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস কেন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইল তাহা আলোচনাব ক্ষেত্র ইহা নহে। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মণ্ডলানা আজাদের কর্মতৎপরতার কথাটাই এখানে আলোচনা করিব। ১৯৩৭ সালে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পব কংগ্রেস একটি পার্লামেন্টাবী সাব-কমিটি নিযুক্ত করিল। তিন জন চিব পবীক্ষিত, বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ ব্যক্তিকে লইয়া ইহা গঠিত হইল :—মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল (চেয়াবম্যান), মণ্ডলানা আজাদ ও ডাঃ বাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই তিন জনের সম্বন্ধে আমেরিকাব একজন লোকপ্রিয় সাংবাদিক মিঃ গান্থাব (Gunther) বলিয়াছেন :—“সাব-কমিটিব সদস্য আজাদ হইতেছেন a part of the brain and spiritual enlightenment of the Congress, ডাঃ বাজেন্দ্র প্রসাদ হইতেছেন heart of the Congress এবং প্যাটেল হইতেছেন the ruthless fist of the Congress।” সাব-কমিটির প্রধান কাজ হইল কংগ্রেস মন্ত্রীদেরকে পরিচালনা করা এবং আইন সভাব সদস্যগণ জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত করেন তাহা স্মৃতীকৃত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা এবং কর্তব্যচ্যুত হইলে তাঁহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত

কবা। ইহাব জন্ম দরকাব ছিল সুপরিকল্পিত গঠনমূলক কার্য-পবিক্রমা, দক্ষতা, বিভিন্ন সদস্তদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা কবিবার কৌশল, কঠোর নিরপক্ষতা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাব-কমিটিব এই তিনজন সদস্তই কম-বেশী এই সব গুণেব অধিকাৰী। তাঁহাদেব প্রত্যেকেই স্থস্থির বুদ্ধি, মুক্ত হৃদয় ও সহযোগিতার মনোভাব দ্বাবা কাজ করিয়া থাকেন। সাব-কমিটি একটা বিবাবট দেশেব তার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কাজের শৃঙ্খলা রক্ষা কবিবার জন্ম প্রত্যেক সদস্তকে এক একটা অঞ্চলের ভাব দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা যাহা কবিতেন তাহা সংযুক্ত দায়িত্বেই করিতেন। নিম্নে কেবল মওলানা আজাদেব কর্মতৎপরতাব কথা বলিব।

মওলানা আজাদ অসাধাবণ পণ্ডিত, চিন্তাশীল, কূটনীতিজ্ঞ। ইহা হইতে অনেকের ধারণা হইতে পারে যে, তিনি গঠনমূলক কাজের অযোগ্য। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার গঠনমূলক কার্যেব দক্ষতা প্রদর্শন কবিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯২৬-২৭ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব সময় তাঁহার গঠনমূলক কার্য-দক্ষতার পবিচয় পাওয়া যায়। সেই দারুণ দিনে গুণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নবহত্যা করিবাব জন্ম প্রকাশ্য বাজপথে চলাফেরা কবিত। যে কেহ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ম চেষ্টা কবিত, তাহাকে প্রাণ হাতে লইয়াই বাহিরে যাইতে হইত। এই দুঃসময়ে মওলানা আজাদ নিৰীকভাবে কলিকাতার সর্বত্র ঘুরাফিরা করিতে লাগিলেন। কোথাও হিন্দু দলকে একতা ও শান্তির জন্ম আবেদন করিতেছেন, কোথাও মুসলমানদের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। এই ভাবে প্রাণপণ করিয়া দাঙ্গাব কেন্দ্রে সৌম্যবদ্য কবিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সময়ের এক দিনের ঘটনাব কথা উল্লেখ করিয়া

মওলানা আজাদ শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইকে বলিতেছেন :—“একটি হিন্দুদেব ঘন বস্তীতে কতকগুলি মুসলমান দর্জি প্রত্যহ বহুদূর হইতে আসা যাওয়া করিত। এবং এই ভাবে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। দাঙ্গার দিনে একটি হিন্দু গৃহে ৬০।৭০ জন মুসলমান দর্জি আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। গুণাগুণ চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুবাঘুবি কবিতোছিল বলিয়া তাহারা বাহিরে আসিতে সাহস করে নাই। এই সব মুসলমানদের জীবনবক্ষা কবিয়াছে বলিয়া আমি স্থানীয় হিন্দুদেবকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি তাহাদিগকে মটবগাডিতে রাখিয়া বাড়ী পছছাইয়া দিবার ব্যবস্থা কবিলাম। মুসলমান পল্লীতে কতকগুলি হিন্দু এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল। একজন মুসলমান তের জন হিন্দুকে আশ্রয় দিয়াছিল, তন্মধ্যে এগার জন ছিল পুরুষ এবং দুইজন ছিল স্ত্রীলোক। সেই গভীর বাত্রে কোথাও ঘোড়া গাড়ী পাওয়া গেল না। করপোবেশনের নিকট ট্যাক্সির জন্ত আবেদন করিলাম। ট্যাক্সি পাওয়া গেলে তাহাদিগকে উহাতে রাখিলাম ও তাহাদের স্ব স্ব বাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। দিবারাত্র তিন দিন আমার আরাম ও শান্তির অবসব হয় নাই। একদিন মধ্যরাত্রে আসানসোল হইতে প্রেরিত একটি পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে, “কতকগুলি লোক দুই দিন হইল আসানসোল হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।” আমি তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তাহাদের আত্মীয়গণকে সংবাদ দিলাম, এবং বাহাতে তাহারা নিরাপদে বাটী পছছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।” মওলানা সাহেব এইভাবে নানা স্থানের ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সমস্তা অতি নিখুঁতভাবে সমাধান করিয়া

দিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশে সিয়া-সুন্নি বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং এই সমস্তার সমাধানের জন্ত তিনি যে পন্থার নির্দেশ কবেন, তাহাই বর্তমান অবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে বিজ্ঞানন্দির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একদল মুসলমান যে তুমুল আন্দোলন করিতে থাকে তাহা তাঁহাবই হস্তক্ষেপের ফলে শান্ত হয়।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারী সাব-কমিটির সদস্যের ক্ষমতা বলে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা বিহার প্রদেশেব হাজাব হাজাব কৃষক প্রজাদেব উপকার করিবে। এজন্য তাহার তাঁহার নিকট চিবকৃতস্ত থাকিবে। কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের যুগে তিনি যে কৌশল ও দক্ষতা সহকাৰে বিহার প্রদেশের জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছেন তাহা তাঁহাব গঠন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। কংগ্রেসেব নির্বাচনী ইশতেহারে জনসাধাবণকে একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, কৃষকদের জন্ত নানা বিষয়ে সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন করা হইবে। কিন্তু কৃষকদের সহিত জমিদারদের চিরকাল ধরিয়া একটা অহিনকুল সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। কৃষকদের ভাল করিতে গেলেই জমিদারগণ তাহাতে বাধা দিত। যুক্ত-প্রদেশটাও বিহারের মত জমিদার প্রভাবিত অঞ্চল। এখানেও কৃষক-জমিদারদের নানা সমস্যা দেখা দিয়াছিল। প্রজাস্বত্ব আইনেব সংশোধনের নাম শুনিয়া বিহারেব জমিদারগণ একটি ডেপুটেশন ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস নেতাদের নিকট সাক্ষাৎ করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। তখন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় ছিলেন। ডেপুটেশন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বুঝিলেন, জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে একটা সম্ভাবজনক

মীমাংসা করিতে হইলে মওলানা আজাদের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডেপুটেশন তৎক্ষণাৎ মওলানা আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি তাহাদের সমুদয় অভিযোগ শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত কথা জ্ঞাত হইবার জন্য অবিলম্বে পার্টনা যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি পার্টনা গমন করিয়া কয়েকদিন তথায় অবস্থিতি করিলেন; এবং ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সহযোগিতায় কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রধান মন্ত্রী ও অগ্রাগ্র মন্ত্রীদেব সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন, এবং যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল তাহাব প্রত্যেকটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। জমিদারদের সহিত আলোচনা করিবাব পূর্বে মওলানা আজাদ সেই সব কংগ্রেস কর্মীদের সহিত খোলা মনে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলেন। যাহাবা এতাবৎ কৃষকদের স্বার্থের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করিতেছিল, তাহাদের দাবীগুলি পরীক্ষা করিলেন এবং এই দাবীগুলিকে ভিত্তি করিয়া জমিদারদেব সহিত আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রজাদের প্রত্যেক দাবী অকাতরে মানিয়া লইবাব মত মনোবৃত্তি জমিদারদেব ছিল না। কিন্তু মওলানা আজাদ ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রজাদের অধিকাংশ দাবী জমিদাবগণ কতৃক স্বীকার করাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন।

আলোচনার সময় মাঝে মাঝে বহু কঠিন ও অদ্ভুত প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহা আপোষ-রক্ষার পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিত। মওলানা আজাদ একটা মৌলিক আদর্শের উপর জমিদারগণকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, প্রজাদের যুগ যুগ ব্যাপী অসুবিধাগুলি এক্ষণ জীবে দূর করিতে হইবে বেন তাহাবা দেহে ও আত্মায় স্বাচ্ছন্দ্য

উপভোগ করিতে পারে। জমিদারগণ এই নীতি স্বীকার কবিয়া লইল। কিন্তু তাব পর প্রথম উঠিল শতকরা কত স্বার্থ তাহাদিগকে ত্যাগ কবিতে হইবে। প্রচলিত আইন অনুসারে একজন জমিদার তাহার প্রজাকে সর্বস্বান্ত করিতে পারিতেন, তাহাব ভিটে, ঘর, বাড়ী, জমি ইত্যাদি সমস্তই কাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু ন্যায় নীতি ও প্রজা কল্যাণের আদর্শ একবার স্বীকার করিলে তাঁহারা কেমন কবিয়া প্রজাদের জমি, ঘর, বাড়ী বাকী খাজনাব দায়ে নিলাম কবিয়া লইতে পারেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তির আসল মূল্য অপেক্ষা বহু কম মূল্যে জমিদারগণ প্রজাদের সম্পত্তি নিলাম করিয়া লন। প্রথমে মনে হইল, ইহাবই জন্ত বুঝি সব আলোচনা ফাঁসিয়া যাইবে। মওলানা আজাদ এ বিষয়ে আলোচনা কবিলার জন্ত প্রধান মন্ত্রীকে আইন সভা মূলতবি রাখিতে অনুরোধ করিলেন এবং অনমনীয় জমিদারগণকে ন্যায় নীতি ও উদারতার দোহাই দিয়া আবেদন করিলেন—তাঁহারা যেন প্রত্যেকটি কাজ মুক্ত হৃদয়ে করেন। তাঁহারা এক হাতে যাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন অল্প হাতে যেন তাহা কাড়িয়া না লন। তাঁহার এই আবেদন বার্থ হইল না। এবং তাঁহার আবেদনের নৈতিক ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। আইন পাস হইবাব পূর্বে কতক ব্যাপাবে জমিদারগণ এমন ব্যবহার কবিতে লাগিলেন যেন আইন পাস হইয়া গিয়াছে। বিহার প্রজাসভা আইন প্রজাদের বোল আনা দাবী গ্রহণ করে নাই। কিন্তু প্রজাগণ বহু বিষয়ে জমিদারদের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সর্বত্র শতকরা পঁচিশ টাকা খাজনা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০ হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত খাজনা হ্রাস হইয়াছে।

প্রজাগণ এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পাইয়াছে, যাহা তাহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে জমির মালিক করিয়া দিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর ব্যতীত জমিদারদের সঙ্গে তাহাদের অন্য কোন সংস্রব নাই। তাহাদের অস্বাভব, ঘর বাড়ী প্রভৃতি ক্রোক করিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। বাকী খাজনার দায়ে এ সব নিলামে বিক্রয় হইবে না। এবং কোন দখলি সম্পত্তি সমগ্রভাবে নির্কূল স্বত্বে বিক্রীত হইবে না। সম্পত্তি সেই অংশটুকু যাহা দেনা পরিশোধেব জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাই বিক্রীত হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাব মূল্য সরকার স্থায়ী অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহা নির্ধারণ করিয়া দিবেন, তাহাই ধার্য হইবে। বাকী খাজনার জন্য যদি জমিদার প্রজার কোন জমি নিলাম বিক্রয় কবিতে চান, তবে প্রজা সেই জমির পরিপূর্ণ মূল্য প্রাপ্ত হইবে। তা ছাড়া প্রজাগণ ইচ্ছামত জমি বিক্রয় করিতে পারিবে। অথবা অন্ততাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে। জমিদার সম্পত্তির হস্তান্তর স্বীকার কবিতে বাধ্য হইবে। প্রজা তাহার হস্তান্তরিত জমি ও সংরক্ষিত জমির মধ্যে খাজনাব হার নির্ধারণ করিবার জন্য জমিদারকে সামান্য মাত্র ফিঃ দিয়া বাধ্য কবিতে পারিবে। প্রজাগণ স্ব স্ব জমির উপর ঘর বাড়ী বাগান কূপ ইত্যাদি নির্মাণ কবিবার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইবে। বাকী খাজনাব দায়ে তাহারা কোনও মতে উচ্ছেদ হইবে না। সুতরাং তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে জমিদারদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই আপোষের ফলে আর একটি আশু উপকার হইয়াছে। জমিদার ও সরকারের মধ্যে একটা বুঝাপাড়া না হইলে জমিদারদের উপর কৃষি-কর স্থাপন কষ্টকর ছিল। কৃষি-করের প্রশ্ন সর্ব প্রথম বিহাবে

দেখা দিল। কিন্তু মওলানা আজাদ ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদেব হস্তক্ষেপের ফলে এ বিষয়েও একটা আপোষ-রফা হইয়া গেল। এবং আইন দ্বারা সর্ব প্রথম বিচারে কৃষি-কর স্থাপন করা সম্ভব হইল। জমিদারগণ বিনা বাধায় ইহা আইন সভায় পাস হইতে দিয়াছিলেন। এই কৃষি-কর তাঁহাদের উপর বাৎসরিক ৪০ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকার বোঝা চাপাইয়াছিল। খাজনা বাবতে জমিদারগণকে বহু টাকা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আর খাজনা কমাতে প্রজাদেব দুই হইতে আড়াই কোটি টাকা লাভ হইয়াছে।

এই সব ব্যাপারে মওলানা আজাদ কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদেব উক্তি হইতে উদ্ধৃত কবিতোঁছি :—“জমিদার ও প্রজাদের সহিত আপোষ আলোচনার সময় মওলানা আজাদেব তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা ও অপরকে বুঝাইবার শক্তির চরম পবিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁহাকে একটা অন্ত্রবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা এই যে, বিহাবের প্রজাস্বত্ব আইনের বিস্তৃত বিবরণ তিনি জানিতেন না। কিন্তু আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই জটিল আইনেব নানা তথ্য জানিয়া ফেলিলেন। এবং দ্রুত সিদ্ধান্তে আসিতে সমর্থ হইলেন। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য এই যে, তিনি অপরকে তাঁহাব মতে আনিতে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইলেন। প্রথমবার কয়েকদিন ধবিয়া দীর্ঘ আলোচনা হইল এবং অধিকাংশ বিষয় স্থিবি হইয়া গেল। পরে মওলানাকে কয়েক দিনেব জগু পাটনায় আসিতে হইল, এবং বহু আলোচনার পর কংগ্রেস ও জমিদারদের মধ্যে একটা আপোষ হইয়া গেল। আমরা ইচ্ছা করিয়া কৃষাণ সভাকে এই আলোচনা হইতে দূরে রাখিয়াছিলাম। তবিস্ততে দরকার হইলে আবও আন্দোলন করিবার

স্বযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত কবি নাই। এই আপোষের মধ্যে তাহাদিগকে লইলে তাহাদের দাবী আর আন্দোলন করা চলিত না। আমরা বুঝিলাম যে, জমিদারদের সম্মতি লইয়া আইন পাস করিতে গেলে প্রজাদের ক্ষণ-যে সব প্রতিকার পাইবার আশা করিয়াছিলাম তাহা পাইতে বিলম্ব হইত। জমিদারদের সহিত আপোষ হইবাব কয়েক মাসের মধ্যে উক্ত আইন পাস হইয়া গেল। প্রজাস্বত্ব আইন ও আয়কর আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের সহিত আলোচনা করিবার সময় মাঝে মাঝে মনে হইত সব বুঝি ফাঁসিয়া যাইবে। কারণ কোন দলই সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না, তখন মওলানা আজাদের অসাধারণ দক্ষতা, আবেদন করিবার শক্তি ও অপরকে বুঝাইবার অপার ক্ষমতা সমস্ত অবস্থাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার গঠনমূলক ক্ষমতা অদ্ভুত। আব এই ক্ষমতার বলেই তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।”

রামগড়ে—রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ

মওলানা আজাদ ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সাধনার বলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেবই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাইয়া আসিতেছেন। আর তাহাবই ফল স্বরূপ ১৯৩৯ সালে সমগ্র জাতি তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিয়াছে। রামগড়ে সভাপতির আসন হইতে তিনি যে যুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা জাতির নির্বাচন যে ভুল হয় নাই তাহাই প্রমাণিত করিল। এই অভিভাষণটি মওলানা আজাদের বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ। কঠোর যুক্তিপূর্ণ কথায় তিনি গাঁথিয়াছেন একটি মালা; সময়ের প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর দৃষ্টি তাঁহাব নিবদ্ধ। তিনি সর্বত্র আভ্যবহিহীন—এবং অবাস্তব বিষয় পরিহার করিতে সিদ্ধহস্ত। পার্টনায় ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিয়াছিল যে, সেবার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটি মাত্র প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে। এবং মওলানা আজাদ স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনিও একটি মাত্র বিষয়কে তাঁহাব অভিভাষণে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবেন। ইহাব একটি অশুচ্ছেদ অতিবিক্ত ছিল না—একটি শব্দ বৃথা ব্যয়িত হয় নাই। সর্বত্র একটা দীর্ঘ, সংযত ও গভীর ভাব বিद्यমান। এই মূল্যবান অভিভাষণের সাবাংশ নিয়ে দেওয়া হইল।

১৯১২ সালে যখন “আল্ হেলাল” প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মওলানা আজাদ দেশবাসীকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আন্তর্জাতিক অবস্থা ঠিকভাবে জ্ঞাত না হইলে মুসলমানের



তথা ভাবতের কোন সমস্তাই সম্যক বোধগম্য হইবে না। কংগ্রেস ১৯৩৬ সালে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতবাসীকে বিশ্ব-পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে নির্দেশ দেয়। কংগ্রেসের এই নীতি মওলানা আজাদের বহু পূর্ব ঘোষিত আদর্শের পরিণতি। এই অভিভাষণে মওলানা আজাদ এই নীতিকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন : “কংগ্রেসের ইতিহাসে ১৯৩৬ সালের লক্ষ্যে অধিবেশন একটা নূতন আদর্শেব ইঙ্গিত দিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে কংগ্রেস আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ কবিয়াছিল, এবং জনসাধারণের সম্মুখে ইহাব সুচিন্তিত অভিমত পবিস্কারভাবে ও দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করিয়াছে। অতঃপর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও তৎসম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা কংগ্রেসের বাৎসরিক ঘোষণাব একটা প্রধান ও অপরিহার্য্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জগতের নিকট ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। এই সব প্রস্তাব একই সঙ্গে বিশ্বের নিকট দুইটি বিষয় ঘোষণা করিতেছে। প্রথমতঃ—আমাদের বর্তমান অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও আমরা আর ভাবতের বাহিরের নিখিল বিশ্বের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহি না। আমরা যখন আগে চলিতে থাকিব, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গড়িতে থাকিব, তখন আমরা কেবলমাত্র আমাদের চতুঃপার্শ্বে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিব না, বহির্জগতের অবস্থার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিব। আজ নানাবিধ পরিবর্তন পৃথিবীর নানা দেশ ও জাতিকে পরস্পরের নিকট করিয়াছে। জগতের এক প্রান্তে চিন্তা ও কর্মের যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহা অবিলম্বেই অন্য প্রান্তে প্রভাব বিস্তার করিবে। সেই জন্য

কেবল নিজের চতুঃসীমার মধ্যে, আবদ্ধ থাকিয়া ভারতের সমস্ত বিবেচনা করা অসম্ভব। ইহা সুনিশ্চিত যে, বহির্জগতেব ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া ভারতকেও প্রভাবিত করিবে। ঠিক এই ভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থা অবশিষ্ট জগতকেও প্রভাবিত করিবে। এই জ্ঞান ও বিশ্বাসবশতঃ আমরা আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। আমরা এই সব ঘোষণার দ্বারা ফ্যাসিজম ও নাৎসিজমের মত প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি—যে ফ্যাসিজম ও নাৎসিজম গণতন্ত্র, ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। এই সব আন্দোলন দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। আব ভাবতবর্ষ এগুলিকে সমগ্র জগতেব উন্নতি ও শান্তির পক্ষে ভয়ানক শত্রু বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আজ সমগ্র ভাবতবর্ষ তাহাদের সহিত একমত যাহারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে বাধা দিতেছে।”

অতঃপব মওলানা আজাদ পবিস্কাব করিয়া বলিয়াছেন : “ভারতের সংগ্রাম ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে নয় ; ইহা যেমন নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে—সেইরূপ ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও। আমরা নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ হইতে উৎপন্ন বিপদের কথা চিন্তা করিতেছি বটে, কিন্তু পুরাতন বিপদ যাহা এই নূতন বিপদ হইতেও জাতির শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে অধিকতর গুরুতর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই পুরাতন বিপদকে সহজে ভুলিতে পারি না। এই পুরাতন ব্যাধিই নূতন ব্যাধির জন্ম দিয়াছে ;—তাহা হইতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। নূতন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকে আমরা

দূর হইতে দেখিতেছি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমবা নিষ্ক্রিয় দর্শক নহি। ইহা আমাদের সম্মুখেই বহিয়াছে—আমাদের গৃহাদি অধিকার করিয়াছে, এবং আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। এই জন্য আমবা পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিয়াছি যে, যদি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের গৃহবিবাদ কোন যুদ্ধ বাধাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ—যাহাকে তাহার নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেও স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে বাধা দেওয়া হইয়াছে—সেই ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ করিবে না। যোগ দিবার প্রস্তাব ভারতবর্ষ তখনই বিবেচনা করিবে, যখন নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও নির্বাচন অনুসারে এতৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার সে পাইবে। ভারতবর্ষ কোনমতেই নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ সহ্য করিবে না। কিন্তু একথাও সত্য যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা ভয়ানক উত্যক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত। ইহাব সহজ অর্থ এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার সমুদয় ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদমূলভ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে চায়। এমত অবস্থায় ভারতবর্ষ কোনমতেই স্বেচ্ছাক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়ের জন্য সহযোগিতার হস্ত প্রসাবিত করিবে না। ইহাই হইতেছে কংগ্রেসের দ্বিতীয় ঘোষণা। আর কংগ্রেস তাহার বিভিন্ন প্রস্তাব দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই ঘোষণা করিয়াছে। লঙ্কো অধিবেশনের পর হইতে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এই সব প্রস্তাব বহুবার গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং এইগুলি কংগ্রেসের “সমর-প্রস্তাব” বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।”

অতঃপর মওলানা আজাদ বলিতেছেন : “কিন্তু ইহা ব্রিটিশ

সবকারেব ইচ্ছাব প্রশ্ন নহে। সহজ ও সরল প্রশ্ন হইতেছে—
ভারতের অধিকার—তাহার নিজের ভাগ্য নিজের দ্বারা নির্ধারণ কবিস্বার
অধিকার আছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর আজিকার সমস্ত
প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে। এই প্রশ্ন ভারতের সমস্তার তিত্তিমূল।
ভাবতবর্ষ এই তিত্তিমূল অপসাবিত হইতে দিবে না। কাবণ ইহা
অপসাবিত হইলে ভারতের জাতীয়তার সমস্ত কাঠামো ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।
বর্তমান সমবেব প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত পবিকাৰ। গত
মহাযুদ্ধের মত এই যুদ্ধেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব যুক্তি পরিকাৰ তাবে
দেখিতেছি। আমরা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কবিয়া তাহাদেব বিজয়ে সাহায্য
করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের দাবী কাচের মত স্বচ্ছ। আমরা ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যবাদকে বিজয়লাত কবিতো ও শক্তিশালী হইতে দেখিতে ইচ্ছা
কবি না। এই তাবে সাহায্য করিয়া আমাদের পরাধীনতার কালকে দীর্ঘস্থায়ী
কবিতো চাহি না। আমাদের পথ বিপবীত দিকে।” এই আলোচনার
শেষে মণ্ডলানা আজাদ বলিতেছেন : “যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ব্রিটিশ
ক্যাবিনেটের কতিপয় সদস্য জগতকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছিলেন যে,
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন পদ্ধতি শেষ হইয়াছে এবং আজ শান্তি ও
স্ববিচার ব্যতীত ব্রিটিশ জাতির অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোষণা
যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ভাবতবর্ষট মর্কপ্রথম ইহাকে আগ্রহের সহিত
গ্রহণ কবিত। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই ধরনের ঘোষণা সম্বন্ধেও
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শান্তি ও স্ববিচারের পথেই বাধা স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।
যুদ্ধের পূর্বেও তাহার আচরণ ঠিক এই ধরনেরই ছিল। ভারতের দাবীই

হইতেছে এই ঘোষণার আন্তরিকতা যাচাই করিবার কষ্টপাথর। ভারতের দাবীৰ দ্বারা ব্রিটেনের ঘোষণা পবীক্ষিত হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে, তাহা মেকী ও অসত্য।”

মওলানা আজাদ হিন্দু-মুসলমান সমস্তা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে এক মহিমান্বিত আসন লাভ কবিবে। ১৯১২ সালে “আল হেলাল” প্রচারের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কবিরাব জ্ঞাত যে সব পলিসি ও প্রচেষ্টা হইয়াছে মওলানা আজাদ তাহাব বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। এই অভিভাষণেও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন : “আজ আমাব সহধর্মীদেরকে স্বরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ১৯১২ সালে আমি যখন তাহাদিগকে এই ইস্ততে আহ্বান করিয়াছিলাম, তখন আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম আজও ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছি। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সেই সময় হইতে অজ্ঞাবধি যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াছি, চক্ষু যে সব বিষয় লক্ষ্য করিয়াছে, আমার মন সে বিষয় চিন্তা কবিয়াছে। আমাব নিকট হইতে এই সব ঘটনা কেবল চলিয়া যায় নাই। আমি ইহাদের মধ্যে ছিলাম, ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি প্রত্যেকটি ঘটনা যত্ন সহকাবে বিচার করিয়াছি। আমি আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারি না, আমাব বিবেকের বাণী রোধ করিতে পারি না। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা বলিয়া আসিয়াছি, আমি আজ তাহারই পুনরাবৃত্তি কবিয়া বলিতেছি যে, ভারতের নয় কোটি মুসলমানের জ্ঞাত ১৯১২ সালে আমি যে পথের দিকে আহ্বান করিয়াছিলাম, আজও সেই পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ভারতের

মুসলমানগণ “মাইনরিটি”—এই ক্রথাটি আমি স্বীকার কবি না। আমার মতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়া যে দল সংখ্যালঘু তাহাদিগকে মাইনরিটি বলা চলে। এবং সেই অজুহাতে তাহারা বিশেষ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা পাইবার হকদাব নহে। “মাইনরিটি” সোজা অর্থ এই :—যে দল অত্যন্ত সংখ্যালঘু এবং এত সংখ্যালঘু যে, নিজেদেরকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। কতকগুলি সংগুণ ও শক্তির অভাবে এই সংখ্যালঘু দল মেজরিটিদের মধ্যে থাকিয়াও নিজেদেরকে এত অসহায় মনে করে যে, তাহারা স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে নিজেদের শক্তির উপর কোন বিশ্বাস রাখিতে পারে না। অল্প দল হইতে সংখ্যায় অল্প হইলেই কোন দল মাইনরিটি পদ বাচ্য হইবে, তাহা নহে। মাইনরিটি হইতে গেলে ইহাই দাবকার যে, এই সংখ্যালঘু দল এত অল্প ও অক্ষম হইবে যে, নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইবে। সুতরাং মাইনরিটি সমস্তা কেবলমাত্র সংখ্যাল্পতার সমস্তা নহে, অগ্ৰাণ্য সৰ্ব্ব ইহাতে থাকা চাই। যদি কোন দেশের লোকসংখ্যার দশ লক্ষ থাকে এক দলে, আর কুড়ি লক্ষ থাকে অন্য দলে, তাহা হইলে ইহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বুঝায় না যে, যেহেতু এক দল অন্য দল হইতে সংখ্যায় অর্ধেক, সেই হেতু এই সংখ্যাল্পদল নিজেদেরকে রাজনৈতিক মাইনরিটি দল বলিয়া মনে করিবে এবং সেই অজুহাতে নিজেদেরকে দুর্বল বলিয়া ধরিয়া লইবে।”

ইহাব পর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মওলানা আজাদ বলিতেছেন :
“তাব পব পূর্ণ এগাব শত বৎসব গত হইয়াছে। হিন্দুর মত ভাবতের
বুকে ইসলামেরও দাবী জন্মিয়াছে। যদি কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া

হিন্দু ধর্ম ভারতের ধর্ম হইয়া থাকে, ইসলামও এক সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের ধর্ম হইয়া গিয়াছে। যেমন একজন হিন্দু গর্বেবর সহিত বলিতে পারে যে, সে ভারতবাসী এবং হিন্দুধর্ম অনুসরণ কবে, সেইরূপ আমরাও গর্বেবর সহিত বলিতে পারি যে, আমরা ভারতবাসী এবং ইসলাম অনুসরণ করিয়া চলি। আমি সীমা আরও বাড়াইয়া দিব এবং বলিব—ভারতীয় খৃষ্টানগণ এই কথা বলিবাব অধিকারী যে, তাহারা ভারতবাসী এবং খৃষ্টান ধর্ম অনুসরণ করিতেছে।” সর্বশেষে মণ্ডলানা আজাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন : “আমরা—ভারতের মুসলমানগণ—ভবিষ্যতেব স্বাধীন ভারতকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিব—ন’, সাহস ও বিশ্বাসেব সহিত দেখিব ? আমরা যদি ইহাকে ভয় ও অবিশ্বাসেব সহিত দেখি, তবে নিশ্চয় আমাদের পৃথক পথ অনুসরণ করিতে হইবে। বর্তমানের কোন ঘোষণা, ভবিষ্যতেব কোন প্রতিশ্রুতি, কোনওরূপ গণতান্ত্রিক রক্ষাকবচ আমাদের এই সন্দেহ ও ভয় দূর করিতে পারিবে না। একপ অবস্থাতে আমাদের তৃতীয় শক্তিব অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই তৃতীয় শক্তি ইতিমধ্যে এদেশে ঘাঁটি গাডিয়া বসিয়া আছে, এবং চলিয়া যাইবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। যদি ভয় ও অবিশ্বাসের পথ অনুসরণ করি, তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধভাবে আমাদের এই শক্তিব স্থায়িত্বের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা সুনিশ্চিত ভাবে বুঝি যে, আমাদের মধ্যে ভয় ও সন্দেহের কোন স্থান নাই, এবং আমরা ভবিষ্যতকে নিজদের উপর সাহস ও বিশ্বাসের সহিত দেখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের অবশ্যস্বাবীরূপে বিভিন্ন পথে কাজ করিতে হইবে। তখন

আমরা নিজেদেরকে একটা নূতন জুগতেব সম্মুখে দেখিব যে, জগৎ সন্দেহের কালমেঘ হইতে মুক্ত—ইতস্ততঃ ভাব, নিষ্ক্রিয়তা ও বিরূপ মনোভাব সেখানে থাকিতে পারে না। বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর্ম ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের সোনালী আলো সে জগৎ হইতে কখনও ঘান হয় না। যুগ-বিপর্যয়েব প্রভাবে কত বাধা বিঘ্ন আমাদের পথে আসিবে—এসব আমাদের পদস্থলন করিতে পারিবে না। বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করিয়া আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ; এবং আমার শরীবের প্রত্যেক শিরা উপশিবা উপরোক্ত দুইটি পথের প্রথম পথটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতোছে, উহাব চিন্তাও আমি সহ্য কবিতে পারি না। আমি চিন্তা কবিতে পারি না যে, কোনও মুসলমান ইহা সহ্য কবিতে পারিবে। অবশ্য যদি সে তাহাব অন্তব হইতে ইসলামেব তেজ ও প্রাণশক্তিকে অপসারিত কবে, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।”

ব্রিটেনের যে সব ব্যক্তি “মাইনরিটি” সমস্তুকে অলজ্জা বাধা বলিতে ক্লান্তিবোধ করেন না, মওলানা আজাদ তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—
“সাম্প্রদায়িক সমস্তুার সমাধানকে জাতীয় আদর্শে পছঁছিবাব প্রধান সর্ভ হিসাবে স্বীকার করিয়া আমবা ইহাব প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়াছি। কংগ্রেস সব সময় এই বিশ্বাস পোষণ কবে, কেহই কংগ্রেসের এই মনোভাবকে অস্বীকার করিতে পারে না। এই সম্পর্কে কংগ্রেস দুইটি মৌলিক-নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং এইগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া কংগ্রেস অগ্রসর হইয়া থাকে :—

(১) ভাবতের জন্ত যে কোন শাসন-তন্ত্র রচিত হউক না কেন, তাহাতে মাইনরিটিদের অধিকার ও স্বার্থের পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি থাকিবে।

(২) মাইনরিটিদের অধিকার ও স্বার্থ কোন্ প্রকার রক্ষা কবচ দ্বারা সংরক্ষিত হইবে তাহা মাইনরিটিগণ নিজেরাই বিচার কবিবে। ইহা মেজরিটিগণ বিচার কবিবেন না। সুতরাং এতৎ সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত মাইনরিটিদের সম্মতিব উপর নির্ভর করিবে, মেজরিটিদের মতের উপর নহে। গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস যে নীতি ঘোষণা কবিয়াছে তাহা উক্ত দুইটি মৌলিক আদর্শের উপর যথেষ্ট আলোকপাত কবিতোছে। যথার্থ মাইনরিটিগণ যদি ইচ্ছা করে, তবে গণ-পরিষদে তাহাদের প্রতিনিধি নিজেদের সম্প্রদায়ের ভোটে দ্বারা নির্বাচিত কবিতে পারিবে। তাহাদের প্রতিনিধি নিজেদের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের ভোটে উপর নির্ভর কবিতে হইবে না। মাইনরিটিদের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে একথা প্রযুক্ত হইবে। গণ-পরিষদে তাহাদের অধিকার ও স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত মেজরিটিদের ভোটের উপর নির্ভর কবিবে না। ইহা মাইনরিটিদের সম্মতি সাপেক্ষ। যদি কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে একমত হওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মাইনরিটিদের সম্মতি আছে এমন কোন নিরপেক্ষ আদালতের নিকট সেই সব ব্যাপার মীমাংসা কবিরার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই শেষ বিধি কেবলমাত্র তখনই প্রযুক্ত হইবে, যখন পরস্পরের আলোচনায় কোন সর্ববাদী সম্মত মত গৃহীত হইবে না। এরূপ ক্ষেত্র খুব কমই উপস্থিত হইবে। ইহা অপেক্ষা কোর্নিও বাস্তব পরিকল্পনা কেহ যদি রচনা কবিতে পারে, তবে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ কবিতে কোনও আপত্তি করিবে না।”

অতপর মওলানা আজাদ বিশ্বয়ের সহিত জিজ্ঞাসা কবিতোছেন . “ব্রিটেনেব

সহিত ভাবতের কোন বুঝাপাড়া কি একেবারেই অসম্ভব? জগতের এই দুইটি জাতি যাহারা শাসক ও শাসিত এই দুই সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ, তাহারা কি যুক্তি, সুবিচার ও শান্তির ভিত্তিতে একটা নূতনতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না? যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে বর্তমান বিশ্ব-সমর সঞ্জাত দুঃখের স্থানে নব-জাত আশা আসিয়া স্থান লাভ করিবে, এবং যুক্তি ও বিচারের নব বিধান ও নব প্রভাতের জন্ম দিবে। আজ যদি ব্রিটেন জগতকে সগৌরবে ঘোষণা করিতে পারে যে, সে ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় যোগ করিয়াছে, তাহা হইলে মানব জাতির পক্ষে একটা বিরাট ও অভূতপূর্ব বিজয় সূচিত হইবে। ইহা অসম্ভব নয়। কিন্তু ইহা কঠিন কাজ।”

রামগড়ে এই বৎসর একটা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অবিকার্য বৃষ্টিধারার মধ্যে প্রথম দিনের কাজ আরম্ভ হইল। কিন্তু মওলানা আজাদ বৃষ্টি ও ঝটিকাকে অগ্রাহ্য করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, প্রস্তাব ও সংশোধনী প্রস্তাব পর দিন আলোচিত হইবে। কিন্তু পব দিনও আকাশে দুর্যোগ লাগিয়াছিল। প্রকৃতির এই দুর্যোগ অগ্রাহ্য করিয়া মওলানা আজাদ কংগ্রেসের পঞ্চাশ হাজার লোক লইয়া সভার কার্য্য ~~চলিতে~~ লাগিলেন। এই হাজার হাজার লোক আনন্দ ও দৃঢ়তার সহিত বৃষ্টি ও ঝটিকার সম্মুখীন হইল। মওলানা আজাদ যদি তাড়াতাড়ি সংশোধনী প্রস্তাবগুলিকে সাবিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে কোন ক্ষতিই ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবকাবীকে তিনি অবসর দিয়াছিলেন। এইভাবে চারি

ঘণ্টার মধ্যে সভার কাজ শেষ কবিলেন। সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেল। এবং একটি মাত্র প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পাস হইয়া গেল।

রামগড় অধিবেশনের পর কংগ্রেস সংগ্রাম-মূলক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করিল। আইন পৰিষদ ত আগেই বর্জন করা হইয়াছে। তারপর আবস্ত হইল আইন অমান্য সংগ্রাম। কিছুদিন পূর্বে যাহারা মন্ত্রী কবিয়া-ছিলেন, তাঁহারা দলে দলে কাবাগাবে বাইতে লাগিলেন। মওলানা আজাদ আইন অমান্য করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্বে আপত্তিকর বক্তৃতা দিবার অভিযোগে ধৃত হইয়া দেড় বৎসরের জন্ত কাবাগারে প্রেরিত হইলেন। প্রায় এই সময়ে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু চারি বৎসরের জন্ত কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রিটেনের সহিত আবার একটা বুঝাপাড়ার কথা উত্থাপিত হয়। সেই জন্ত তাঁহারা দণ্ড ভোগেব পূর্বেই মুক্তি প্রাপ্ত হন।

মুসলিম লীগের অভিযোগ ও তাহার স্বরূপ

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর কংগ্রেস আর্টট প্রদেশে গঠনমূলক কাজ কবিত্তেছিল। কিন্তু অধিকদিন তাহা কবা সম্ভব হইল না। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমর আবিস্ত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কট দেখা দিল। এই বিশ্বজোড়া সঙ্কটের সময় ভারতের স্থান কোথায়? বস্তুতঃ ইউরোপীয় মহাসমর ভারতবর্ষকে রূঢ় বাস্তবতাব সম্মুখে উপস্থিত করিল। মহাসমর প্রমাণ করিল যে, ১৯৩৫ সালের ভারত আইন ভারতবাসীকে কোন ক্ষমতা দেয় নাই। বড লাট আইন সভার অনুমতি না লইয়াই ভারতবর্ষকে যুদ্ধবত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত আইনের বহু ধারাকে আপৎকালীন ব্যবস্থা বলিয়া স্থগিত করিল। সুতরাং প্রাদেশিক মন্ত্রীদেব দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা বড লাটের বাড়িয়া গেল। কংগ্রেস দেখিল—ইহাতে স্বায়ত্ত-শাসন অচল হইয়া যাইবে। নির্বাচক মণ্ডলীকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে বর্তমান অবস্থায় তাহা পালন করা সম্ভব হইবে না। মন্ত্রীত্ব করিতে গেলে সে প্রতিশ্রুতি ভাঙিতে হইবে। তাই কংগ্রেস মন্ত্রীদেবকে পদত্যাগ করিবার নির্দেশ দিল। কিন্তু পদত্যাগ করিবার পূর্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ কবিল, এবং এই উদ্দেশ্য কি ভাবে ভারতের প্রতি প্রযুক্ত হইবে তাহা জানিতে চাহিল। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ইহার কোন উত্তর দিল না। এবং তাহাব চিবাচবিত ভেদনীতিক

এই সুযোগে আবার জাগাইয়া তুলিল। কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ যথার্থভাবে এই কথাব উপব জোর দিলেন। তিনি বলিলেন : “আমরা কি এতই যুক্তিহীন যে, এই যুদ্ধেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিতে পারিব না ?” জাতির এই দুঃসময়ে মওলানা আজাদ পন্থা নির্দেশে ওয়ার্কিং কমিটিকে বাস্তব উপদেশ দিয়া নিজের বাস্তব জ্ঞানের পবিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের উদ্দেশ্যকে বিকৃত রূপ দিবাব জন্য এবং নিজেদেব পলিসি প্রকাশে বিলম্ব কবিবাব জন্য সেই বহু নিন্দিত মাইনবিটি সমস্তাকে উদ্ধাইয়া দিলেন। ভাবতেব প্রতিক্রিয়াশীল দল ও উপদলেব যে সব কাল্পনিক অভিযোগ থাকিতে পাবে, এবং দীর্ঘকাল ভেদনীতিব অবশ্যস্তাবী পবিণতি স্বরূপ যে সব সমস্তা উঠিতে পারে, ব্রিটিশ সরকার সেইগুলিব প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কবিলেন। আব এই ধরণেব মত বিশিষ্ট দলগুলিকে ও তাহাদের নেতাদেবকে কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবাব জন্য যেন তাঁহাবা সোপানমে আহ্বান কবিলেন। ইহাদেব দ্বারা জগতবাসীকে ইহাই বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছিল যে, কংগ্রেস-তন্ত্র ভাবত অপেক্ষা কংগ্রেস-বিরোধী ভারতই সংখ্যাগবীষ্ঠ ও প্রধান। কংগ্রেস-বিরোধী ভারত ব্রিটিশ সরকারেব নিকট হইতে কোন ঘোষণা চাহে না। তাহারা কংগ্রেসকেই ভয় কবে এবং ব্রিটেনেব আশ্রয়কে অধিকতর নিবাপদ মনে কবে। কিন্তু কংগ্রেস এই সব কৌশলে বিভ্রান্ত হইল না। কংগ্রেস দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করিল যে, ভারতের সমস্ত উপাদানের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত দাবী দ্বারা যে গঠনতন্ত্র রচিত হইবে, কংগ্রেস তাহাই মানিয়া লইবে। তবে এই প্রতিনিধিগণকে পূর্ণ বয়স্ক ভোটাধিকার বা তদনুরূপ কোন

নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। কিন্তু মুসলিম লীগ ইহাতে সম্মত হইল না। বরং লীগ-নেতারা মাইনরিটি স্বার্থের নামে কংগ্রেসের এই সম্মত দাবীকে বাধা দিতে লাগিলেন।

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবার সময় হইতেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রত্যেকটি কাজেই বাধা দিয়া আসিতেছিল। যখনই কংগ্রেস কোন প্রকার নিষ্পত্তি বা জন্তু আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তখনই লীগ অবাস্তব ও অসম্ভব দাবী তুলিয়া কংগ্রেসের উত্তমকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। মুসলিম লীগ হঠাৎ দাবী করিয়া বসিল যে, কংগ্রেসকে স্বীকার করিতে হইবে যে, লীগই মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, আর কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কংগ্রেস এ দাবী স্বীকার করিতে পাবে নাই। কারণ তাহা হইলে কংগ্রেসের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসকে অস্বীকার করিতে হয়। কংগ্রেস যখন মন্ত্রীত্ব করিতেছিল, তখন লীগ-নেতারা নানা মিথ্যা অভিযোগ তুলিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। তাঁহারা গবর্ণরগণকে আবেদন করিবার এমন কোন স্বযোগ পান নাই, যাহাতে গবর্ণরগণ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এইসব কাল্পনিক অভিযোগ দূর করিতে পারেন। কারণ ভারত আইনে মাইনরিটি রক্ষার জন্ত গবর্ণরগণের হাতে যে বিশেষ ক্ষমতা নির্দিষ্ট আছে, তাহা প্রয়োগ করিবার মত কোন ঘটনাই ঘটে নাই। যতদিন কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব করিতেছিল, ততদিন লীগ নেতাগণ কেবলই হৈ চৈ করিতেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস যখন স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিল, তখন কতকগুলি লীগ নেতা এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া ভাল কবে নাই। যাহাতে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ না করে, সে জন্তও কোন

কোন লীগ নেতা আবেদন কবিস্থাছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীত্ব ত্যাগের অল্পকাল পরেই মিষ্টাব জিন্না “মুক্তি-দিবস” ও “ধন্যবাদ-দিবস” পালন করিবার জন্ত একটি ঘোষণাপত্র প্রচার কবিলেন। কারণ তাঁহার মতে মন্ত্রীত্ব ত্যাগের দিন মুসলমান সমাজ মেজরিটি শাসনের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। তিনি ইহাতেই ক্ষান্ত থাকেন নাই। ইহার কিছুদিন পবে ‘বয়াল কমিশন’ নিযুক্ত ও ভারত-বন্টনের তথা পাকিস্থানের দাবী করিয়া বসিলেন। ভাবতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত কবিতে হইবে, এক ভাগ দেওয়া হইবে হিন্দুদেবকে ও অন্য ভাগ দেওয়া হইবে মুসলমানকে। মিষ্টার জিন্না কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনয়ন কবিয়াছেন, তাহা শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নহে, তাহা মওলানা আজাদের বিরুদ্ধেও বটে। কারণ কংগ্রেসী-মন্ত্রীদের বহু পলিসি তাঁহার নির্দেশ ক্রমেই গৃহীত হইয়াছে। যদি এই অভিযোগগুলি সত্য হয়, তবে কংগ্রেস ক্যাবিনেটের প্রধান সদস্য হিসাবে ও পার্লামেন্টারী সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে মওলানা আজাদ স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কংগ্রেসে নিজের স্থান ও মর্যাদা রক্ষাব জন্তই তিনি মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার সহ্য কবিয়াছেন। মওলানা আজাদের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক অভিযোগ আর কিছুই হইতে পারে না। মিঃ জিন্নার আবোপিত এই সব অভিযোগ মওলানা আজাদ ধীরভাবে ও নিরপকভাবে পরীক্ষা কবিস্থা দেখিয়াছেন, এবং একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি দিয়া তাহার প্রতিবাদ কবিস্থাছেন। তাঁহার সেই বিবৃতির কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

“কংগ্রেস যখন স্বচ্ছায় ও নিজের প্রস্তাবক্রমে আর্টটো প্রদেশের মন্ত্রীত্ব

ত্যাগ করিল, তখন লীগ-সভাপতির পক্ষ হইতে মুসলিম-ভারতকে দিবার মত কি উপদেশ থাকিতে পারে ? তাহা এই :—তাহারা দলে দলে মসজিদের পথে অগ্রসর হইবে, এবং খোদাতালা কংগ্রেসী-মন্ত্রীস্বের কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে (খোদাকে) ধন্যবাদ দিবে। যে কংগ্রেস ক্ষমতা অপেক্ষা কর্তব্যকে আগ্রহের সহিত বাছিয়া লইয়াছে, যে কংগ্রেস কেবল ভারতের স্বাধীনতার ইশতে নয়, বরং প্রাচ্য দেশের সমস্ত পদানত জাতির অধিকার ও স্বাধীনতার ইশতে পদত্যাগ করিয়াছে, সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার জন্য মুসলমানকে মসজিদে গিয়া খোদাকে ধন্যবাদ দিতে বলা হইয়াছে। কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যতই মত বিরোধ থাকুক না কেন, মুসলমান সমাজ সমগ্র জগতেব সম্মুখে নিজেদেরকে এই ভাবে চিত্রিত হইতে দিবে, ইহা কল্পনা করিতে আমার মনে বড়ই বেদনা হইতেছে। নিজেদের অধিকার ও স্বার্থের জন্য যে কোন ধর্মের সংগ্রাম করিবার পূর্ণ অধিকার মুসলমানদের আছে। ইহা তাহাদের আত্যন্তরীণ ঝগড়া। কিন্তু যে পন্থা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে, তেমন কোন পন্থা তাহাদের অবলম্বন করা কখনই উচিত হইবে না। কিন্তু মিঃ জিন্নার বর্তমান আচরণ এই পথে মুসলমান সমাজকে লইয়া যাইতেছে। ইহার সোজা অর্থ এই যে, মুসলমানগণই ভারতেব স্বাধীনতার পথে বাধার স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। ১৯১২ সালে এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আমি মুসলমান সমাজকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সাতাশ বৎসর পরে আমাকে আবার সেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে হইতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। কেন মিষ্টার জিন্না

মুসলমানদিগকে “মুক্তি দিবস” পালন কবিত্তে বলিতেছেন ? কারণ তাহা বা কংগ্রেসের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এই অত্যাচারের পৰিমাণ ও স্বরূপ কি ধৰণে ? মিঃ জিন্নাৰ মতে “কংগ্রেসী-মন্ত্রীগণ স্থিতিবতাবে পরিকল্পনা করিয়া মুসলিম-বিবোধী কার্য কবিয়াছেন। মন্ত্রীগণ নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া ও আইন প্রণয়ন কবিত্তে গিয়া যথাসাধ্য মুসলিম মতামতকে পদদলিত কবিয়াছেন। মুসলিম সংস্কৃতি ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদের ধৰ্ম্ম ও সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ কবিয়াছেন এবং তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকাৰে পদাঘাত কবিয়াছেন।” এক্ষণে যদি আমবা তৰ্কস্থলে স্বীকার করিয়া লই যে, মিঃ জিন্না যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা যথার্থ, তবে আমাদিগকে বিবেচনা কবিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ? ইহার সিদ্ধান্ত অতি পরিষ্কার :—আটটি প্রদেশেব গবৰ্ণমেন্ট ক্রমাগত মুসলমানদের সামাজিক ও ধৰ্ম্মীয় জীবনে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন, তাহারা মুসলমানদের সংস্কৃতি ধ্বংস করিয়া চলিয়াছেন, তাহাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকাৰে পদাঘাত কবিয়াছেন—আর এই সকল অত্যাচার মাত্র কয়েক দিন হয় নাই, এগুলি বিনা বাধায় দীৰ্ঘ আড়াই বৎসব ধৰিয়া চলিয়াছে। এই অকল্পনীয় অত্যাচারের পর ভারতের আট কোটি মুসলমান সাক্ষাৎ তাৰে কি কর্মপরিক্রমা অবলম্বন কবিয়াছে ? দীৰ্ঘকাল যাবৎ তাহারা এই ~~অসহ্য~~ অপেক্ষা কবিয়াছে যে, কখন স্বেচ্ছায় ও নিজের প্রস্তাবক্রমে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিবে। এবং তাহাদের এই স্বপ্ন যখন পূর্ণ হইল, তখন তাহা বা কন্দের দ্বার খুলিয়া দিয়া খোদাব নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল এবং

বনি-ইসরাইলদেব মত তাঁহারা ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মুক্তির দিন আসিয়াছে। মিঃ জিন্না জগতের সম্মুখে ভারতের মুসলমানদেব কি সম্মানজনক চিত্রই না আঁকিয়াছেন। এই কলঙ্কজনক চিত্র আমার পক্ষে মুসলমান হিসাবে এক মুহূর্ত্ত সহ করা অসম্ভব। আমি ইহা স্বীকার করিতে মোটেই প্রস্তুত নহি যে, ভারতের আট কোটি মুসলমান এতদূর অসাড় ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের স্ব স্ব আটটি প্রদেশের গবর্ণমেন্ট আড়াই বৎসর যাবৎ তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে থাকিবে, তাহাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করিতে থাকিবে, তাহাদেব আর্থিক ও বাজনৈতিক স্বার্থ পদদলিত করিতে থাকিবে, আর তাহারা শাস্তভাবে মিঃ জিন্না বিবোধিত “মুক্তি দিবসের” সুপ্রভাতের জ্ঞাত অপেক্ষা করিবে। ভারতের মুসলমানদের আত্মসম্মানের পক্ষে ইহা অপমানকর কথা। ইহা সূখার পরিবর্তে তাহাদেব মধ্যে গরল প্রবেশ করার তুল্য। এই ধবণের অত্যাচারী গবর্ণমেন্টকে সহ করিবাব দিন বহু দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। মিঃ জিন্না যে অভিযোগ করিয়াছেন তদনুরূপ অত্যাচার করিয়া অল্প দিনের জ্ঞাতও শাসনকার্য্য পরিচালন করা আজকাল কোনও গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি (মিঃ জিন্না) স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, ‘কোন ব্যতিক্রম না করিয়া প্রত্যেক কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট একই ভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। আমি ঘোষণা করিতেছি যে, যদি একজন মন্ত্রী এই প্রকার অত্যাচার করিত, তাহা হইলে ভারতের মুসলমানদের নিশ্চয় সেই কর্তব্যবোধ থাকিত, সেই জ্ঞান থাকিত, নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেই চেতনা থাকিত যাহার জ্ঞাত তাহারা মিঃ জিন্নার

প্রস্তাবিত “মুক্তি দিবস” প্রতিপালন করিবার আশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত না। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের অস্তিত্ব কাল সীমাবদ্ধ করিয়া দিত। নিশ্চয় ভারতীয় মুসলমানগণ চেতনাহীনতা ও ভীরুতা এই দুই উপাদানে গঠিত নহে। নির্বিকার ভাবে তাহাদের ধর্মীয়, সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে পদাঘাতকে স্বচক্ষে অনবরত দেখিবার মত ধৈর্য্য তাহাদের থাকিত না।

“এই প্রসঙ্গে স্মরণ বাখিতে হইবে যে, মিষ্টার জিন্নাব অভিযোগ এই নহে যে, সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া স্বচ্ছ করিবার জন্য যাহা যাহা উচিত ছিল, কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ তাহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, অথবা কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রদেশের মুসলমানের কতকগুলি অভিযোগ আছে, অথবা শাসন ব্যাপারে কোন কোন মন্ত্রী কতকগুলি ভুল করিয়াছেন। যদি অভিযোগেব প্রকৃতি এইরূপ হইত, তাহা হইলে তাঁহার অভিযোগগুলি অর্থোক্তিক বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারিত, এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ তদন্ত করিবার মত ত্রায় সঙ্গত অভিযোগ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু মিষ্টার জিন্না এই ধরনের লোক নহেন। সমগ্র কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সাধারণ ভাবেই এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রত্যেক পলিসি ইচ্ছা করিয়াই মুসলিম বিবোধী হইয়াছে, তাঁহারা অনবরত মুসলিম সংস্কৃতি ধ্বংস করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা অনবরত মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং সর্বদাই মুসলমানের আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমি পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছি এবং সমস্ত দায়িত্ব লইয়া এখনও ঘোষণা করিতেছি যে, কংগ্রেসী

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কংগ্রেসী-মন্ত্রীগণ ইচ্ছা কবিয়া মুসলিম-বিদ্বেষী পলিসি অবলম্বন কবিয়াছিলেন বলিয়া যে অভিযোগ কবা হইয়াছে, তাহা মিথ্যাব পর্বত বচনা কবা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মন্ত্রীগণ মুসলমানের ধর্ম সংক্রান্ত বাজ্জনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকাবে হস্তক্ষেপ কবিয়াছেন বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহাও নির্জলা মিথ্যা। কোন অভিযোগ প্রমাণ কবিবার জন্য জগতে যে সব সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, মিঃ জিন্না, অথবা যাহারা অভিযোগ করিতে চান, তাঁহাদের উচিত সেই সকল পদ্ধতি দ্বারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আবোপিত অভিযোগ প্রমাণ কবা। যদি তিনি তাহা প্রমাণ কবিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানুষ এই আশা কবে যে, তিনি যেন তাঁহাব বসনা ও লেখনীকে সংযত কবিয়া রাখেন। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মুসলমানের যে সব অভিযোগ আমার গোচরে আসিয়াছে তাহার প্রতি আমার ব্যক্তিগত আচরণ বর্ণনা কবিবার ইহা ক্ষেত্র নহে। পবে বিস্তারিত ভাবে আমি তাহা করিব। সংক্ষেপে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, এই সময়ের মধ্যে যে কোন অভিযোগ আমার নিকট আসিয়াছে, আমি নিরপেক্ষ ভাবে সেগুলি তদন্ত কবিয়াছি। পার্লামেন্টারী সব-কমিটির সদস্যগণ, ওয়াকিং কমিটির-সদস্যগণ, প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সদস্যগণ, সকলেই জানেন যে, এই সব ব্যাপারে আমার আচরণ কিরূপ কঠোর ও আপোষহীন ছিল। কোন কোন ব্যাপারে কেবলমাত্র মন্ত্রীদের উত্তর দেখিয়া সন্তুষ্ট রহিতাম না, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের সমস্ত নথিপত্রগুলি

আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরীক্ষা করিতাম, এবং প্রত্যেক বিষয়কে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিতাম। এই প্রসঙ্গে আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে, মিঃ জিন্নার অভিযোগেব যদি একটি ভগ্নাংশ মাত্র সত্য হইত, তাহা হইলে আমি রুংগ্রেসী মন্ত্রীদেবকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্ত ও গদীতে বসিয়া থাকা সহ করিতাম না। যদি মিঃ জিন্না ও তাঁহার সহকর্মীগণ মনে কবেন যে, তাঁহারা মুসলমান সমাজেব কল্যাণেব জন্ত এই সব কথা বলিতেছেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে সমস্ত অন্তর দিয়া বলিব যে, তাঁহারা ঠিক বিপরীত কাজ করিতেছেন। যদি তাঁহারা এই মনোভাব পরিত্যাগ না কবেন, তবে তাঁহারা মুসলমানের সত্যিকাবের কোন উপকাব করিতে পারিবেন না। সত্যিকারের সমাজ সেবাব আজ মুসলমানের সব চেয়ে বেশী অভাব হইয়াছে।”

ইহাব উপব টীকাটিপ্পনী নিম্নয়োজন। ইসলামের সেবা করিতে মওলানা আজাদ কখনও কাতর হন নাই। ত্রিপলি যুদ্ধেব সময়, বলকান যুদ্ধেব সময়, এবং খিলাফত আন্দোলনেব সময় মওলানা আজাদই ভারতীয় মুসলমানকে ইসলাম সেবাব যথার্থ আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আব আজ যখন প্রতি-ক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক নেতাগণ মুসলমান সমাজকে বিপথে লইয়া বাইতেছেন, তখনও মওলানা আজাদ মুসলমানের প্রতিনিধিরূপে স্বাধীনতার পতাকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

মওলানার ধর্মমত

ইসলাম ধর্মে মওলানা আজাদের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেবেলা হইতে ধর্ম বিষয়ক বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ কবিয়াছেন। কিন্তু অত্যাণ্ড আলেমদের মত তিনি গোঁড়া মত পোষণ করেন না। ধর্ম সম্বন্ধে ও তাহাব ব্যাখ্যায় তিনি সব সময় উদার মত পোষণ করেন। নানা গ্রন্থ ও নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার মনকে সর্বপ্রকার গোঁড়ামীর বন্ধন হইতে মুক্ত কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়কে স্বাধীনভাবে দেখিবাব ও আলোচনা কবিবাব জন্য তাঁহার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেই জন্য প্রাচীন ধর্মীয় মতবাদের ও গোঁড়া শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি স্বাধীন ভাবে স্বীয় সমালোচনার কষ্টিপাথরে বিভিন্ন সমস্যাতে পরীক্ষা কবিয়া থাকেন। মওলানা আজাদকে সম্যক ভাবে বুঝিতে হইলে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে সব ধর্মীয় মতবাদ (theological school) প্রচলিত আছে, সেগুলির কিছু কিছু বিবরণ জানা দরকার। পবিত্র কোর-আন ও হদীসের বিভিন্ন ভাষ্য-কারগণ যুক্তির বিভিন্ন পথ ধবিয়া চলিতেন। এই সব ভাষ্যকারগণের কেহ ভক্তির দিক দিয়া, কেহ যুক্তির দিক দিয়া এবং কেহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। মওলানা আজাদ এই পথ তিনটির আশ্রয় লইয়া থাকেন। কিন্তু তত্পরি তিনি আর একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে ইসলামকে পাঠ কবিয়াছিলেন, সেইটা হইতেছে বিশ্ব পরিস্থিতির দৃষ্টিভঙ্গী। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে খুব কম আলেমই ইসলামকে দেখিয়া-

ছিলেন। মওলানা আজাদ একটা নূতন “ইলমে কালাম” (অর্থাৎ ইসলামের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাব অভিনব পথ) আবিষ্কার কবিয়াছেন। তিনি কঠোর যুক্তি পূর্ণ মন লইয়া সকল বিষয়েব শিকড়ে প্রবেশ কবিত্তে ভালবাসেন। কোন বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে গ্রহণ কবিত্তে অস্বীকার করেন। প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—অথবা বড় বড় ‘অথাবিটিব’ দ্বাবা সমর্থিত হইয়াছে, এই অভ্যুহাতে তিনি কোন বিষয়কে আত পবিত্র ও অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহারা বিশ্বাস কবে শাস্ত্রে সবই লেখা আছে, শাস্ত্রেব বাহিরে আব কোন বিষয়ই নূতন হইতে পাবে না, তিনি তাহাদেব অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহাব একটা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। শাস্ত্রেব প্রত্যেক বচনকে তাহাব পূর্ববর্তী বিষয়েব সহিত তুলনা করিয়া এবং শাস্ত্রোক্ত সমুদয় আদর্শেব মর্ম্ম দ্বাবা পরীক্ষা করেন। শুধু তাহাই নহে, মূল বচনের সহিত সমগ্র গ্রন্থেব উদ্দেশ্যের কি সম্বন্ধ আছে তাহাও বিবেচনা করেন। ধর্ম্মের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য হইতে ধর্ম্মেব মূল শিক্ষাকে বাছিয়া লইতে চাহেন। এই সকল কাবণে তিনি ইসলামকে তথা কোর-আনকে অগ্রাণ্ড লেখক ও ভাষ্যকারের মত দেখেন না। তিনি তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে আলোচনা করেন।

তাঁহাব সূক্ষ বিচার বুদ্ধি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীব জলন্ত প্রমাণ হইতেছে তাঁহাব রচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ “তাবজুমাল কোর-আন”। ইহা একাধারে পবিত্র কোর-আনেব অনুবাদ ও ভাষ্য। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন উপক্রমণিকায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই অনুবাদের একটা ইতিহাস আছে তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যখন তিনি রচিত্তে চারি বৎসর

অন্তৰীণে আবদ্ধ ছিলেন, তখন এই গ্রন্থেৰ দুই তৃতীয়াংশ শেষ কবিয়া-ছিলেন। তিনি ইহাব শেষ অংশ লিখিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় একদিন ডেপুটি কমিশনাৰ হঠাৎ তাঁহাব আবাসস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই তাঁহাব গৃহ পুত্ৰাৰুপুত্ৰ ভাবে অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন, এবং হাতেৰ কাছে পবিত্ৰ কোর-আনেৰ অনুবাদেৰ পাণ্ডুলিপিগুলি পাইয়া লইয়া গেলেন, এবং তাহা ভাৰত সরকারেৰ নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অন্তৰীণ হইতে মুক্তি পাইবাব পৰ সেগুলি তাঁহাকে ফেব্ৰুৱাৰী দেওয়া হয় নাই। তিনি এজন্ত বহু লেখালেখি কৰিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে লৰ্ড সিংহেৰ মধ্যবৰ্ত্তিতায় ভাৰত সরকারকে আবেদন কৰিলেন। তখন তাঁহাকে বিহাব গবৰ্ণমেণ্টেৰ নিকট আবেদন কবিতে বলা হইল। বিহাব গবৰ্ণমেণ্টে অবশ্য তাঁহাকে পাণ্ডুলিপিগুলি ফেব্ৰুৱাৰী দিলেন, কিন্তু সেগুলিব অধিকাংশ অগ্নিদগ্ধ হইয়া ছিঁড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছিল, তাহাব পাঠোদ্ধাৰ কৰা সম্ভৱ ছিল না। ইহাব কাৰণ স্বৰূপ বিহাব গবৰ্ণমেণ্টে তাঁহাকে জানাইলেন, যে গৃহে এই পাণ্ডুলিপি ছিল তাহাতে আগুন লাগিয়াছিল, ইহাব একটা অংশ একেবাৰেই পুড়িয়া গিয়াছিল। গবৰ্ণমেণ্টে বুঝিতে পাবেন নাই যে, এইভাবে একটা অমূল্য ৰত্ন হেলায় নষ্ট হইয়া গেল। মিঃ জে, এস, মিলেৰ ভৃত্য কাৰলাইলেৰ 'ফৰাসী বিপ্লবেৰ' প্ৰথম খণ্ড পুডাইয়া দিয়া কি ক্ষতি কৰিয়াছিল তাহা যেমন সে জানিতে পাবে নাই, দায়িত্বশীল বিহাব গবৰ্ণমেণ্টেও মওলানা আজাদেৰ উক্ত গ্রন্থেৰ মৰ্যাদা বুঝিতে পাৰেন নাই। অসীম ধৈৰ্য্যশীল কাৰলাইল যেমন পুনৰায় প্ৰথম খণ্ড লিখিয়া ফেলিলেন, মওলানা আজাদেও আৰাব বহু কষ্ট সহকাৰে সমস্ত গ্রন্থই নূতন কবিয়া লিখিয়া ফেলিলেন। মওলানা আজাদেৰ

এই গ্রন্থ ইসলামী-সাহিত্যে এক অপূর্ব দার্ন। যাহাবা বাজনীতি বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত নহেন, তাঁহাবাও এই গ্রন্থকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। কারণ মওলানা আজাদের গভীর জ্ঞান, সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাহিবেও বিশ্ব-মুসলিমের নিকট সুপরিচিত ও সমাদৃত।

মওলানা আজাদ একটা মৌলিক প্রস্তাবনা লইয়া তাঁহার এই গ্রন্থ আবস্থ করিয়াছেন। সে প্রস্তাবনা হইতেছে “ধর্মের শিকড়।” সমস্ত ধর্মের শিকড় এক। প্রত্যেক দেশ, জাতি ও যুগের জন্য এক এক জন পয়গম্বর বা প্রেবিত মহাপুরুষ ও শিক্ষক আসিয়াছেন। তাঁহাবা যে মূল নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা সর্বদাই একই বিষয়কে লইয়া। মওলানা আজাদ কোব-আনের একটা শ্লোক উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, যে দেশেই হউক না কেন, যে যুগেই হউক না কেন, খোদাব দ্বারা প্রেবিত পয়গম্বরণ মানব জাতির জন্য একই সর্বজনীন উপদেশ দিয়াছেন, যথা :—বিশ্বাস ও সংকল্প ; অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা ও সংব্যবহার। যে কোন শিক্ষা যাহা এই আদেশের বিপরীত তাহা ধর্ম নহে। কোব-আন বলিতেছে :—“জগতের প্রত্যেক জাতির জন্য আমি একজন পয়গম্বর পাঠাইয়াছি—তিনি তাহাদিগকে আল্লাহকে পূজা করিতে, এবং বিপুল দ্বারা বিভ্রান্ত না হইতে শিক্ষা দিয়াছেন।” (৬—১৮) কোব-আন আরও বলিতেছে :—“তোমার পূর্বে আমি এই আদেশ ব্যতীত অন্য কোন আদেশ দিয়া পয়গম্বর পাঠাই নাই যে, আমি এক আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিতে হইবে না।” কোব-আন আরও বলিতেছে যে, “খোদা সকল মানুষকে মানুষ তাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারাই বিভিন্ন নাম ও ছাপ লইয়াছে এবং মানুষের একতাকে

টুকরা করিয়া কাটিয়া দিয়াছে।” তোমরা যেমন বিভিন্ন বস্তু হইতে জন্মগ্রহণ কব, তেমনি তোমরা বিভিন্ন নাম গ্রহণ কব এবং একে অপরা হইতে পৃথক হইয়া পড়। তোমরা বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ কর, সেইজন্ত তোমাদের এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকেব সহিত যুদ্ধ কবে। তোমরা বিভিন্ন জাতিব (Race) অন্তর্ভুক্ত, সেই জন্ত তোমরা পরস্পর মারামারি কর। তোমরা বিভিন্ন বর্ণ লইয়া জন্মগ্রহণ কব, তাই তোমাদের পরস্পরের ঘৃণা হইতে বর্ণযুদ্ধ হইয়া থাকে। এই ধরণেব আবও অগন্ত বিভাগ আছে যথা, ধনী নিধন, প্রভু ভৃত্য, উচ্চ বংশ, নিম্ন বংশ, সবল দুর্বল, ইত্যাদি। এই সব বিভাগ ঝগড়া ও অনৈক্য সৃষ্টি কবিত্তে বাধ্য। তাহা হইলে কোন্ ‘বেশমী সূতা’ এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত টুকরাকে একত্র করিয়া একটি মালা গাঁথিয়া দিতে পারে, এবং বিভক্ত মানবমণ্ডলীকে এক অবিভক্ত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ কবিত্তে পারে? সেই ‘বেশমী সূতা’—সেই পবিত্র বন্ধন হইতেছে—এক আল্লাহ্‌ব পূজা। তোমরা পরস্পর হইতে যতই বিভক্ত হও না কেন, তোমাদের পৃথক আল্লাহ থাকিতে পারে না। তোমরা সকলেই এক আল্লাহ্‌ব ভৃত্য। এবং তোমাদের প্রার্থনা ও উপাসনা সেই পবিত্র আল্লাহ্‌র জন্তই। তোমার দেশ কি, জাতি কি, উপজাতি কি, তাহা দেখিবার দরকার নাই। যে মুহূর্ত্তে তুমি সেই এক পিতার পদে আত্মসমর্পণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তোমাদের সমস্ত পার্থিব ঝগড়া-বিবাদ শেষ করিয়া দিবেন। এবং তোমাদের হৃদয়কে একত্র করিবেন। তখন তুমি বুঝিবে যে, সমস্ত বিশ্ব তোমার দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি একই পবিত্রভূক্ত, আর তোমরা সকলে একই পিতার সন্তান। পবিত্র কোর-আন এই

কথাই জোরের সহিত ঘোষণা কবিতেছে যে, প্রেবিত ধর্ম ও মহাপুরুষ বা পয়গম্ববগণ ইহা হইতে পৃথক কোন বিশেষ শিক্ষা দেন নাই। আব ইহা হইতে বিভিন্ন কোন সত্যও জগতে নাই। তাই কোব-আন বলিতেছে :—
 “তোমবা যদি আমার শিক্ষাব সত্যতা অস্বীকার কব, তাহা হইলে যে কোন গ্রন্থ হইতে ইহাব বিপবীত কথা বাহির কব, এবং এই সত্য ও জ্ঞানের বিরোধী শিক্ষা বাহিব কর যাহা তোমবা পূর্বে প্রাপ্ত হইয়াছ।”
 (৪৬—৩) তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কোব-আন ঘোষণা করিতেছে যে, সর্ব ধর্মের চিরন্তন সত্য এক ধর্ম অপব ধর্মকে সমর্থন করিতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটা চিব শাস্ত্রত সত্য বিদ্যমান আছে।

মওলানা আজাদ অতঃপব ধর্মের শাস বা সাব সত্য কি সেই সম্বন্ধে দৃঢ় ভাবে ঘোষণা কবিতেছেন যে, ধর্মের একটা আছে শিকড, আব কতকগুলি আছে শাখা-প্রশাখা। কোব-আন বলিতেছে যে, সমস্ত ধর্ম ও শিক্ষাব দুইটি অংশ আছে, একটাব দ্বাবা ধর্মের চিরন্তন নীতি প্রকাশ পায়, এবং অপরটা ধর্মের বাহিবের আকার। প্রথমটা হইতেছে মৌলিক বিষয়, অপরটা হইতেছে অপ্রধান বিষয়। কোব-আন প্রথম অংশকে বলিতেছে faith বা বিশ্বাস। আব দ্বিতীয় অংশকে বলিতেছে আচরণের নিয়ম-পদ্ধতি। এই দুই বস্তুকে ‘শারা’, ‘মশ্ক’ বা ‘মিনহাজ্জ’ বলা হয়। এই শব্দত্রয়ের প্রথম দুইটির অর্থ হইতেছে ‘পথ’ ও তৃতীয়টাব অর্থ হইতেছে পূজাব বিশেষ নিয়ম-কানুন। কোব-আন ঘোষণা কবিতেছে যে, জগতের বিভিন্ন ধর্ম মৌলিক বিষয়ে পৃথক নহে; চিবন্তন ধর্মের মত তাহাও চিরন্তন। কিন্তু আচরণের নিয়মে ও

পূজার পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। ধর্মসমূহ শিকড়ে পৃথক নহে, কিন্তু পত্রে শাখা-প্রশাখায় তাহাবা পৃথক। মূলেব দিক দিয়া কোন ধর্ম পৃথক নহে—কিন্তু বাহ্যিক আকাবে, বা দেহে তাহাবা পৃথক। আর বাহ্যিক দিকে এই যে পার্থক্য, ইহা অবশ্যস্তাবী। ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—মানবজাতির কল্যাণ সাধনা। কিন্তু দেশ ও যুগ অনুসারে মানুষের অবস্থা বিপর্যয় হয়, তাহাদেব মধ্যে নানা পার্থক্য ঘটয়া থাকে। এবং প্রত্যেক দেশে বা যুগে একটা বিশেষ ধরণের জীবন যাত্রার পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন দেশের ও যুগের জন্ত বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির দরকার হয়। সেই জন্ত প্রত্যেক ধর্মের বাহ্যিক আকাবে দেশ ও যুগের প্রভাব প্রতিফলিত হয়; সেই জন্ত দেশ ও যুগের উপযোগী করিয়া বাহ্যিক আকার সৃষ্টিত হয়। কোর-আন বলিতেছে: “হে পয়গম্বর। আমি প্রত্যেক মানব সংঘের জন্ত একটা বিশেষ ধরণের পূজা পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাহা তাহাবা পালন করে। সুতরাং এই সব বাহ্যিক আকার লইয়া মানুষের মধ্যে ঝগড়া করা উচিত নহে।” (২২—৬৭)। কোর-আন এইখানে ক্ষান্ত হয় নাই, আবও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে এবং যাহা সকল ধর্মের সাব সত্য সেই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছে। মানুষ কেমন করিয়া তাহার কল্যাণ পাইতে পাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে কোর-আন বলিতেছে: “মানুষ কোন দিকে মুখ বাখিয়া পূজা করে তাহাতে ধর্ম নাই, ইহা পূর্ব কি পশ্চিম এই প্রশ্নের মধ্যেও ধর্ম নাই। বরং সার সত্য এক আল্লাহের পূজাতে এবং সঙ্গত আচরণে নিহিত আছে।” কোর-আনের মূল শ্লোকের অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল:—

“তুমি পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিবাও,—ইহা ধর্ম নহে।

কিন্তু ইহাই ধর্ম, যথা—আল্লাহকে বিশ্বাস করা, শেষ বিচারের দিনে, ফেরেশতাতে এবং প্রেরিত পুস্তকে ও পয়গম্বরে বিশ্বাস করা। ধর্ম নিহিত আছে—তঁাহার প্রেমের জন্ত তোমার সম্পত্তি ব্যয় কবাতে, তোমার আত্মীয় স্বজনের জন্ত, পিতৃহীনের জন্ত, অতাবীব জন্ত, পথচাবীব জন্ত, যাহাবা চাহে তাহাদের জন্ত, দাসদের মুক্তি-মূল্যের জন্ত, প্রার্থনায় দৃঢ় থাকিয়া নিয়মিত দয়া করাতে, সেই চুক্তি পূর্ণ কবাতে যাহাতে তুমি আবদ্ধ হইয়াছ,—বেদনায়, দুঃখে বিপদে এবং দুঃখের সকল সময় দৃঢ় হওয়ায় ও ধৈর্য্যশীল হওয়ায়—এই সবেই ধর্ম নিহিত আছে। এই সব লোক সত্যের পথে ও ঈশ্বর-ভীক।” (২—১৭৭)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কবিতে গিয়া মওলানা আজাদ বলিতেছেন :—
 “নিম্নের মহা শ্লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর : প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের জন্ত আমি একটা বিশেষ আইন ও পথের ব্যবস্থা দিয়াছি। খোদা যদি চাহিতেন, তবে তিনি তোমাদেরকে একই ধরণের কবিতে পারিতেন। (অর্থাৎ তাহা হইলে বাহ্যিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না।) কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পৃথক কবিয়াছেন এই জন্ত যে, তোমরা তঁাহার আদেশ পালন কর কিনা তাহা তিনি পরীক্ষা কবিতে চাহেন। সুতরাং (এই সব পার্থক্যের উপর বেশী জোর না দিয়া) সংগ্রাম কর, সং আচরণের জন্ত। (৫—৪৮) যখন কোব-আন অবতীর্ণ হয়, তখন বিভিন্ন ধর্মের অনুবর্তীগণ ধর্মের বাহ্যিক আকারের উপর অধিক জোর দিত। তাহারা ভ্রম বশতঃ এই বাহ্যিক আকারকেই ধর্মের মূল বস্তু বলিয়া মনে কবিত। প্রত্যেকেই মনে কবিত—তাহার নিজের ধর্মের অনুসরণকারী ব্যতীত অন্য কোন পথে মুক্তি নাই।

কাবণ তাহাদের আচাব ও ক্রিয়া-কাণ্ড তাহার মত নহে। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কোব-আন ঘোষণা করিল যে, ইহা ধর্মকে অস্বীকার করার নামাস্তব মাত্র। ধর্মের সার হইতেছে—এক আল্লাহের পূজা করা ও ন্যায় সঙ্গত আচরণ করা। ধর্ম কোন একটা বিশেষ সমাজ ও সম্প্রদায়ের একচেটিয়া পৈতৃক সম্পত্তি নহে। আচাব ও ক্রিয়া কাণ্ড সব সময়ই পৃথক হইবে, দেশ ও যুগের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি পৃথক হইতে থাকিবে। কোব-আনের শ্লোক আবও অগ্রসব হইয়া বলিতেছে যে, খোদা তাহাব সর্ব জ্ঞানের জন্ত ইচ্ছা করিয়াই এই বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ শ্লোক আবও ঘোষণা করিতেছে যে, বিভিন্ন বিধি ও পথ দেওয়া হইয়াছিল বিভিন্ন লোকের জন্ত। কোব-আনের শ্লোক ইহা বলে না যে, বিভিন্ন মানুষের জন্ত বিভিন্ন ধর্ম দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বিভিন্ন পথের কথাই বলা হইতেছে। কাবণ সকলের জন্তই ধর্ম এক ও অভিন্ন। বিভিন্ন বা একের অধিক ধর্ম হইতে পাবে না। তাই কোব-আন ঘোষণা করিতেছে যে, মানুষের প্রকৃতি একরূপভাবে গঠিত যে, এই সব বাহ্যিক পার্থক্য নিশ্চয় ঘটিবে, এবং প্রত্যেকে মনে কবে যে, তাহার পন্থা অপব হইতে শ্রেষ্ঠতব। মানুষ তাহাব প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া নিজের বস্তুকে দেখিতে পাবে না। কিন্তু তোমাব দৃষ্টিতে যেমন তোমার পথ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অন্য লোকের দৃষ্টিতে তাহার পথ শ্রেষ্ঠ। তাহা হইলে উদাবতাই একমাত্র পথ।”

কোব-আনের আবও তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মওলানা আজাদ দেখাইতে চান যে, কোব-আন যাহা শিক্ষা দিতে চায় এগুলি তাহার

সাব মর্শ্ব, যথা একবিংশ সুরাব—২২, ২৩, এবং ২৪ শ্লোক। এই তিনটি শ্লোকে আছে :—

২২—এই সব পয়গম্বকে যে শিক্ষা দিয়াছি তাহা এই যে—তোমরা সকলেই একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত (কোন পৃথক ধর্ম নাই, কোন পৃথক দল নাই)। এবং আমিই তোমাদের সকলের এক মাত্র (পোষণকাবী) প্রভু। সুতরাং আমাকেই পূজা কব (এবং এই বিষয়ে পৃথক হইও না)।

২৩—কিন্তু মানুষ নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের এক ধর্মকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়াছে, শেষে সকলকে আমাদের দিকেই ফিবিয়া আসিতে হইবে।

২৪—সুতরাং (এই সত্য স্বরণ রাখিও) যে কেহ মৎ কাজ কবে, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। আমরা তাহার মৎ কাজ সমূহ নথীভুক্ত করিতে বহিয়াছি।

এই সব শ্লোক হইতে মওলানা আজাদ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতেছেন :—

“বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জনসমাজের মধ্যে যে সমস্ত পয়গম্বর আসিয়াছেন, তাঁহাদের সমস্ত শিক্ষাব সাবাৎসার তবে কি? বিভিন্ন যুগেব ও বিভিন্ন দলেব মানব মণ্ডলীব জন্ত তাঁহাদের কি বাণী ছিল? তাহা কি এক ছিল, অথবা বহু ছিল? ২২ শ্লোক বলিতেছে যে, তাঁহাদের বাণী একটি মাত্রই ছিল এবং তাহা এই :—তোমরা সকলে মানব জাতিব একটি মাত্র ভ্রাতৃ-সংঘ। তোমাদের পালন কর্ত্তা ও রক্ষা কর্ত্তা এক জনই। সুতরাং তোমরা পবম্পব বিচ্ছিন্ন হইও না,—কেবল তাঁহাকেই পূজা কব। কিন্তু মানুষ এই শিক্ষা

ভুলিয়া গিয়াছে এবং ধর্মকে বহু শাখায় বিভক্ত করিয়াছে এবং একটি ধর্ম হইতে নানা ধর্ম বচনা করিল এবং এক দল অপর দল হইতে কাটিয়া গিয়া সবিন্দা আসিল। একত্রেব পবিবর্তে বহুত্ব, মিলনের পবিবর্তে বিচ্ছেদ হইয়া পড়িল তাহাদের সমব ধ্বনি। কিন্তু শেষে প্রত্যেককে তাঁহারই দিকে ফিবিয়া যাইতে হইবে। সেখানে প্রত্যেক বস্তুই দেখান হইবে, এবং প্রত্যেক দল দেখিবে—সং কাজ কবিত্তে ভুলিয়া যাওয়াতে তাহারা কোথায় গিয়া পঁহছিয়াছে।

“সমস্ত গৌরব ঈশ্ববেব। কোর-আন তাহার অপূর্ব ভাষাব ষাদুতে একটি সংক্ষিপ্ত শ্লোকেব দ্বাবা বহু তাব প্রকাশ কবিয়াছে। ইহা কেবল একটা বিবৃতি নহে। ইহা এমন তাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইহা যুক্তিব একটি অবিত্ত বন্ধন হইয়া বহিয়াছে। খোদা ধর্মিতেছেন : (ক) তোমরা যতই বিভাগ সৃষ্টি কব না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না, তোমাদের ভ্রাতৃত্ব নিশ্চয় এক। (খ) আমিই তোমাদের একমাত্র বক্ষা কর্ত্তা, এবং আর কেহই নহে। (গ) সমগ্র মানব জাতি একদলভুক্ত এবং অদ্বিতীয় তাবে তাহাদের বক্ষা কর্ত্তা এক। তাহা হইলে পূজাব ও ‘সেজদার’ ধাবা এক হইবে না কেন? কেন তাহা দুইটি হইবে? স্মৃতবাং কেবল তাঁহাকেই পূজা কর। কারণ তোমরা এক এবং সেই একেরই জন্ম। সর্বত্র এই একেব কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কোথাও বহুর কথা নাই। কোর-আনের উল্লিখিত “সেই জন্ম” এই কথাটি সমস্ত যুক্তিকে ঝাঁকড়াইয়া আছে।

“তিনটি একত্বের (unity) কথা কোব-আনেব উক্ত শ্লোকগুলিতে

সংক্ষেপে বর্ণিত আছে :—বিশ্বমানব ভ্রাতৃত্বের একতা, ঈশ্বরের একতা, এবং ধর্ম ও ঈশ্বর পূজার একতা, আব এই তিনটি একতাই হইতেছে কোর-আনের বাণীর মূল নীতি। এই মহাবাণী কোর-আন সর্বত্র ঘোষণা করিতেছে। কোর-আনের সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার ভিত্তি এই তিনটি একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভ্রাতৃত্বের একত্বের অর্থ এই যে, মানব জাতির বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাব অন্তর্নিহিত একত্ব লুক্কায়িত আছে। ইহা ভুলিয়া যাইও না যে, তোমাব জাতি, বর্ণ, ভাষা, দেশ প্রভৃতি যতই পৃথক হউক না কেন, তোমাব সকলে মানব জাতির একই পরিবাবের অন্তর্ভুক্ত। এবং বাস্তবিকই তোমাব একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত। ঈশ্বরের একত্ব অর্থে এই বুঝায় যে, তোমাব ঈশ্বরের যত বিভিন্ন নাম সৃষ্টি কর না কেন, তোমাব জন্ম যত বিভিন্ন স্থান সৃষ্টি কর না কেন, তোমাব ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যত বিভিন্ন ধারণা কর না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের পৃথক ধারণাব জন্ম যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা প্রকৃত স্বত্বকে রূপান্তরিত বা পৃথক করিতে পারেন না। তোমাব যেমন একই ভ্রাতৃসংঘের অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রকার তোমাদের বন্ধকও এক, তিনি বহু নহেন। পূজাব একত্বের মানে এই যে, যদি একই ভ্রাতৃসংঘ থাকে, তাহা হইলে একটি ধর্ম থাকিবে, একেব অধিক ধর্ম থাকিবে না। স্মরণ্য সং আচরণ হইতেছে এক আল্লাহর পূজা করা। এবং এই এক আল্লাহর পূজা করার ব্যাপারে কেহ যেন বিভক্ত ও পৃথক না হয়।”

উপরোক্ত ৯৪ শ্লোকে মুক্তি ও ধর্মের মূল সূত্রগুলি পবিত্র ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেগুলি এই যে, মানবজাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও সং

আচরণের (Righteousness) মূল বিষয়গুলি এক ও অভিন্ন। কোব-আন বলিতেছে যে, সেগুলি সকল যুগে একই ধরণের ছিল, যথা—খোদাতে বিশ্বাস ও সংকর্ষ। যে কোন মানুষ সংকর্ষ কবে তাহাব সাধনা, এবং যে মানুষ ঈশ-প্রেমে পরিপূর্ণ—তাহার সাধনা কখনও ব্যর্থ হইবে না,—তাহা নিশ্চয় খোদাব নিকট গৃহীত হইবে। এখানে “যে কোন” এই কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। যিহুদীগণ বলে—আগে যিহুদী হও, খৃষ্টানগণ বলে—আগে খৃষ্টান হও, তবে মুক্তি পাইবে। কিন্তু কোব-আন বলিতেছে যে, “যে কেহ সংকর্ষ করিবে এবং খোদাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে—কে সেই ব্যক্তি তাহাতে কিছু আসে যায় না, যদি তাহাব খোদা-প্রীতি থাকে, এবং যদি সে সংকর্ষ করে, তবে তাহাব বিশ্বাস ও কর্ম কখনও ব্যর্থ হইবে না। সে নিশ্চয় পুৰস্কার পাইবে। ইহাই বিধি। তাহাব বিশ্বাস ও কাজ আমাদের দপ্তরে থাকিবে। কে আমাদের দপ্তর হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিতে পাবে? জগতের প্রত্যেককে মনে করিতে দাও যে, তাহাব এই সংকর্ষ ও বিশ্বাস ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমাদের দপ্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত থাকিবে।” কি স্মহান আদর্শ! তুমি যদি কোব-আনের বিভিন্ন লেখকের ভাষ্যের প্রতি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে, তবে দেখিবে, কি অপ্রাসঙ্গিক তর্ক-বিতর্ক দ্বারা ইহাব স্পন্দন অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

“যেখানে বিভিন্ন পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, সেখানে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মওলানা আজাদ কোব-আনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন :—“কোব-আন বলিতেছে—যাহারা ঈশ্বরের পথে চলিতে চায়, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য যে, বিভিন্ন পয়গম্বরের মধ্যে ও বিভিন্ন

১১২ মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ

শাস্ত্রের মধ্যে যেন কোন পার্থক্য না করে। তাহাদেবকে সমভাবে বিশ্বাস করিতে ও কাহাকেও অস্বীকার না করিতেই কোব-আন নির্দেশ দিতেছে। সর্বক্ষেত্রে এই প্রকার মনোভাব রাখা কর্তব্য। যাহা সত্য—তাহা চিব কালই সত্য—তাহা যখনই আসিয়াছে ও যাহাবই নিকট আসিয়াছে তাহাতে কিছু যায় আসে না—এবং আমি তাহা সর্বদাই বিশ্বাস করি। ইহাই হইল কোব-আনের শিক্ষা।”

মওলানা আজাদের ব্যাখ্যাত কোব-আনের আব একটা শ্লোকের কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। যাহাবা ধর্মবিশ্বাসকে আচরণ হইতে পৃথক করিয়া দেখেন, মওলানা আজাদ তাঁহাদের অন্তর্গত নহেন। এই বিষয়টি তিনি তাঁহাব কোব-আনের ভাষায় সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন :—“যিহুদীগণ বিশ্বাস করে যে, তাহাবাই ঈশ্বরের একমাত্র নির্বাচিত জাতি, আব ঈশ্বর তাহাদিগকে যে ধর্মীয় সত্য দিয়াছেন তাহা তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। কিন্তু কোব-আন তাহা অস্বীকার করিতেছে। যিহুদীদের ধর্মাসক্ততার সীমা ছিল না। তাহাবা বলিত যে, যেহেতু তাহাবা যিহুদী, সেই হেতু তাহাবা নবকের অগ্নি হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আব যদিও খোদা তাহাদিগকে নবকের আগুনে প্রবেশ করেন, তবে তাহা তিনি ক্রোধবশতঃ করিবেন না। তিনি এই জন্ত তাহাদিগকে নবকে প্রেরণ করিবেন যে, তাহাবা যেন নবকের আগুন দ্বারা বিদগ্ধ হইয়া আরও পবিত্র হইয়া ও নির্মল হইয়া স্বর্গে যাইতে পাবিবে। কোব-আন এই অসাব দস্ত চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, এবং জিজ্ঞাসা করিতেছে : তোমরা কোথা হইতে এই ধারণা পাইলে যে, প্রত্যেক যিহুদীকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, সে মুক্তি

পাইবে এবং নবকের আগুন হইতে অব্যাহতি পাইবে? ঈশ্বর কি তাহাদিগকে মুক্তির সনদ দিয়া ফেলিয়াছেন? যখন তোমাদের এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, তখন কি তোমরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছ না? এবং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছ না?” কোর-আনেব শ্লোকটি এইরূপ :—(“হে মুসলমানগণ, স্মরণ কর), তোমাদের আকাজক্ষার উপর মুক্তি নির্ভর কবে না, অথবা যাহাদের উপর পবিত্র গ্রন্থ আসিয়াছে তাহাদের ইচ্ছার উপর মুক্তি নির্ভর কবে না। ঈশ্বরের বিধি এই যে, যে কেহ মন্দ কাজ করিবে তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে, তখন ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে সে কোন সাহায্যকাবী অথবা বন্ধু পাইবে না।” “আবুসেনিক” বা সেকো বিষ খাইলেই মবিতে হইবে, ইহাতে ফিলদী, অথবা অন্য কোন জাতির মধ্যে কোন ভেদ নাই, অথবা যে দুধ খাইবে সে পুষ্ট হইবে, ইহাতেও কোন জাতি-বিচার নাই। সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যেক মানুষ তাহাই পাইবে যাহা সে রোপণ করিবে— তাহার ধর্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না।”

মওলানা আজাদ কি কখনও এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের প্রভুত্ব স্থাপনে বিশ্বাস করেন? ১৯২২ সালে আদালতে বিচারকালে তিনি জবানবন্দী স্বরূপ যে বিবৃতি দেন, তাহাতে Sovereignty of Islam (ইসলামের প্রভুত্ব) কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছিলেন? ইসলামের তিনি যে উদাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে, তিনি জগতের বুকে মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াসী। তাঁহার বিবর্ত তফসীর বা ভাষ্য “তারজুমামুল কোর-আন” এই মতবাদের প্রতিবাদ করিতেছে।

তাঁহাব এই তফসীর হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। তাঁহাব দৃষ্টিতে “ইসলাম” শব্দের অর্থ হইতেছে “সত্যকে স্বীকার করা ও সেই অনুসারে কাজ করা”। কোর-আন বলিতেছে যে, ধর্মের সাব সর্বত্র একই প্রকার, যথা :—ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত পথ অনুসরণ করিয়া চলা। সত্যেব এই পথ কেবল মানবের জ্ঞাত নহে, বরং সমগ্র সৃষ্ট জীবের জ্ঞাত। সুতরাং “ইসলামের প্রভুত্ব—ইহার অর্থ এই যে, তাহাদেবই প্রভুত্ব যাহাবা চিন্তায়, কথায় ও কাজে ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই আদর্শ অপেক্ষা কম নহে, বেশীও নহে, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরেব প্রভুত্বে ও সং আচরণে বিশ্বাস কবে, তাহাদেরই প্রভুত্বে মওলানা আজাদ বিশ্বাস করেন। তাই মওলানা আজাদ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন যে :—ইসলাম নূতন ধর্ম নহে,—যাহাবা ঈশ্বরের পথ হইতে সরিয়া আসিয়াছে, ইসলাম তাহাদিগকে সেই পথে লইয়া যাইবাব জ্ঞাত আহ্বান ব্যতীত আব কিছুই নহে। কোর-আনের সাধাবণ ভাষ্যেব সহিত মওলানা আজাদের ভাষ্যের পার্থক্য এইখানে রহিয়াছে। মওলানা আজাদের মত এমন উদার ভাবে আব কেহ কোর-আনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। ইসলামকে বুঝিতে হইলে আমাদের এই গ্রন্থ পড়া একান্ত দরকার। ইসলামিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব গ্রন্থ। মুসলমান সমাজে ইহার যতই আদর হইবে, ততই সমাজের অন্ধ মানসিকতা দূর হইয়া যাইবে। ইসলামে জ্ঞানলাভেছু প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান-ইহা একজন ভারতীয় মুসলমানের অমূল্য উপহাৰ।

মওলানা আজাদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য

মওলানা আজাদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছ'একটা কথা বলিয়া এই গ্রন্থেব উপসংহাৰ করিব। দীৰ্ঘ ঋজু ও গোববৰ্ণ—এই মাত্ৰুষাটিক চেহাবাৰ মধ্যে এমন একটা বাজোচিত ভাব আছে, যাহা একই সঙ্গে তাঁহাব বুদ্ধি, প্রতিভা ও তেজস্বিতাব পবিচয় দেয়। মওলানা আজাদ ইসলামেব শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিৰ পূৰ্ণ প্রতীকস্বরূপ। তাঁহাব আচবণে ও কথাবাব্তায় এমন একটা যুহুতা ও মার্জিত কুচিৰ ভাব বিহুমান আছে যে, তিনি যেখানেই গমন কবেন, সেইখানেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন। ইহাব সহিত যুক্ত হইয়া আছে তাঁহাব একটা গম্ভীৰ ও সংবন্ধিত ভাব। ইহাবই জন্ত জনসাধাবণ নিত্য যে সব নেতাদের সহিত পরিচিত হয়, তাঁহাকে তাঁহাদের পর্যায়ে ফেলিতে পাবে না। জনপ্রিয় হইতে হইলে যে সব গুণের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাতে অল্প আছে। সেই জন্ত তিনি সৰ্ব্বত্র জনপ্রিয় নহেন, অথবা তাঁহাব সম্বন্ধে অধিক লোক বেশী আলোচনা করে না। তাঁহাব গম্ভীৰ জ্ঞান ও জানিবাব অসীম পিপাসাব সহিত যুক্ত হইয়াছে তাঁহাব স্বাধীন চিন্তা এবং উদাব ও সংস্কারমুক্ত হৃদয়। একাকী থাকিতে ভালবাসেন বলিয়া সব সময় সৰ্ব্ব শ্রেণীৰ লোকেব সতিত মেলামেশা কবেন না। দৰিদ্ৰ লোকেৰ প্রতি সহানুভূতিব অভাবে যে তিনি সৰ্ব্বসাধাবণ লোকেব সহিত মেেশেন না, তাহা নহে। পিতাব আশ্রয়ে একাকী থাকিবাব যে অভ্যাস তিনি শৈশব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পবিণত বয়সেও তাহা পরিত্যাগ কবেন নাই।

দেশের দরিদ্র লোকেব জন্ত তিনি অগ্ন্যাগ্ন নেতাদের মতই মর্শবেদনা অনুভব করেন। তিনি বলেন : “যাহাদের কিছু আছে, আব যাহাদের কিছু নাই, এই দুই দলের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা চিরতবে বিদূষীত না হইলে প্রকৃত স্বরাজ আসিবে না। গবীবদের অবস্থা উন্নত কবিবার একটা সুন্দর উপায় হইতেছে খদ্দব। খদ্দবের সার্বজনীন ব্যবহার আমাদের চিন্তা করিতে বাধ্য করে যে, আমরা এক যায়গায় আমাদের লক্ষ লক্ষ পদানত জনসাধারণের সহিত এক হইয়া গিয়াছি। আমরা যুগ যুগ ধরিয়া যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, সেখান হইতে কি আমরা নিয়ে আসিতে চাই? আমরা কি চাই না যে, আগাদের অপেক্ষা হতভাগ্য ভ্রাতাগণ আমাদের সহিত একই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে থাকুক, আমাদের সঙ্গে কাজ কবিতে থাকুক? আমরা কি চাই না যে, আমাদের জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম কবিয়া আমাদের মতই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করুক?—এবং স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করুক? নেতারা যদি চাহেন যে, জনসাধারণ তাহাদের সহিতই জাগিয়া উঠিবে, তাহা হইলে সার্বজনীন খদ্দব ব্যবহার ব্যতীত অন্য পথ নাই।”

মওলানা আজাদ দরিদ্র দেশবাসীর কথা খুবই ভাবেন। তবে তিনি এমন উপাদানে গঠিত যে, গান্ধীজীর মত গ্রামে গিয়া তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করেন না। মওলানা আজাদ নিজ ক্ষমতা ও শক্তির সীমা খুব ভাল কবিয়াই বুঝেন। আর বুঝেন বলিয়াই সীমা লঙ্ঘন কবেন না। এইদিকে তাঁহার বেশ একটু দুর্বলতা আছে। কিন্তু তাঁহার অগ্ন্যাগ্ন গুণের কথা চিন্তা করিয়া এই দুর্বলতাটুকু কেহ বড় একটা লক্ষ্য কবেন না। তাঁহার গভীর বিজ্ঞা ও মানসিক তাব তাঁহাকে সর্বদাই একটা উচ্চ আসনে সমাসীন করিয়াছে।

তিনি যেন যুক্তি ও বিচার বুদ্ধিব সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। তিনি আলোচ্য প্রত্যেকটি বিষয়ের সপক্ষ ও বিপক্ষ দিকগুলি যুক্তিব নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিয়া থাকেন, তবেই কোন বিষয়ে মনস্থির করেন। ইচ্ছাৎ কোন একটা বিষয় বুঝিবাব তাঁহার অপার শক্তি আছে। সেই শক্তিব বলে তিনি অনেক বড় বড় সমস্যা জলের মত বুঝিয়া ফেলেন এবং অপবকেও বুঝাইয়া দেন। কোন কঠিন সমস্যাকে তিনি বাগ্মীতা ও পবিচ্ছন্নতার দ্বারা এমন সহজভাবে বুঝাইতে পারেন, যাহা বহু লোকে পারে না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তবজ্রন দাশ তাঁহার অন্তবঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই মওলানা আজাদের পবামর্শ গ্রহণ করিতেন। স্ববাজ্য পার্টিতে কোন বিষয় আলোচনার জন্ত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু নৈতিক ও মানসিক সমর্থনের জন্ত মওলানা আজাদের উপর নির্ভর করিতেন। গান্ধীজীব কোন “পয়েন্ট” অগ্রান্ত নেতাবা সহজে ধবিতে পারিতেন না। কিন্তু মওলানা আজাদ নিমেষ মধ্যেই তাহা ধবিতে পারিতেন এবং মহাত্মাজীকে বলিতেন, “মহাত্মাজী। আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাব এই কথাটি ধবিতে পারিয়াছি।” তখন বৃদ্ধ পণ্ডিত মতিলাল তামাসাচ্ছলে বলিতেন যে, “দুঃখ এই যে মওলানা, আপনি প্রত্যেক বিষয়কে তাড়াতাড়ি বুঝিতে পাবেন।” তখন নেতাদের মধ্যে হাসির হব্বা উঠিত।

মওলানা আজাদ যখন কঠোর হন এবং কোন গুরুতব বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তখন মূর্তি অন্তরূপ। কংগ্রেস দলের মধ্যে তাঁহার মত কুটনৈতিক ডিপ্লোমাট খুব কমই আছে। একবার কোন একটা বিষয় গ্রহণ কবিলে তিনি তাহাকে সকল দিক হইতে ও সকল প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে

বুখারিয়ার জন্তু তাঁহাব জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। ইহাতে তাঁহাব সমকক্ষ কেহই নাই। এই জন্তু অনেক কঠিন বিষয় সিদ্ধান্ত করিবাব পূর্বে গান্ধীজী তাঁহাব দিকে পুনঃ পুনঃ তাকাইয়া থাকেন। গান্ধীজী ও মওলানা আজাদের মধ্যে এক অকৃত্রিম ভালবাসা বিद्यমান আছে। তাঁহারা পবম্পরে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৩৯ সালে সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রী সমস্‌তাব সমাধান করা কঠিন হইয়া উঠিল। ব্যাপারটি এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল যে, শেষে উহা গান্ধীজীব নিকট আনিত হইল। মওলানা আজাদ বলিলেন,—“আমার মন আমাকে এক দিকে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু এই সব ব্যাপাবে আমি আপনাব পরামর্শ চাই।” কিন্তু তদুত্তরে গান্ধীজী বলিলেন—“না, তাহা হইবে না, আগি স্থির কবিয়াছি যে, এই ব্যাপাবে আপনাব কথাই চবম হইবে এবং আমি বল্লভভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আপনাব কথা মানিয়া লইতে উপদেশ দিব।” তদুত্তরে মওলানা আজাদ বলিলেন : “কিন্তু আমার নিকট আপনাব কথাই শেষ কথা।” এইভাবে উভয় নেতার মধ্যে অনেকক্ষণ ধবিয়া স্নেহপূর্ণ ভাষায় কথা কাটাকাটি হইল। অবশেষে মওলানা আজাদকেই সিন্ধুব ভাব লইতে হইল। তিনি কিকপ দক্ষতার সহিত সিন্ধুব সমস্‌তাব সমাধান কবিয়াছেন তাহা দেশবাসী অবগত আছেন। গান্ধীজীর প্রতি মওলানাব এই যে ভালবাসা তাহাব কারণ ক্রিঃ ইহার উত্তরে মওলানা আজাদ বলিয়াছেন : “গান্ধীজীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যতীত সত্যোব প্রতি তাঁহাব আগ্রহ আমাকে তাঁহাব প্রতি আকৃষ্ট কবিয়াছে। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত আমি বহু ক্ষেত্রে সন্ধিঞ্চচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহাব পব “Young India”তে গান্ধীজীব একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তাহাতে

তিনি তাঁহার জীবন একটা সামান্য 'পদস্থলনের জন্ত তাঁহার আত্মাকে খুলিয়া দিয়াছিলেন। মিসেস গান্ধীকে কোন ব্যক্তি একটা উপহার দিয়াছিল, তাহা তিনি আশ্রমেব ম্যানেজারকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই জন্ত তিনি "Young India"তে প্রবন্ধ লেখেন। তখন আমি বুঝিলাম, গান্ধীজী একজন মানুষ যাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার শত্রুগণও সন্দেহ কবিত্তে পারে না। তাঁহার সত্য-প্রীতি তাঁহাকে কতদূর লইয়া যাইতে পারে তাহা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।"

বহুকাল হইতে মওলানা আজাদ কংগ্রেস মহলে এক অপূর্ব মর্যাদা ও প্রতিপত্তি পাইয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসেব সভাপতি হিসাবেই হউক, আব অণ্ডভাবেই হউক, সর্ব অবস্থায় তিনি কংগ্রেসেব একজন প্রধান উপদেষ্টারূপে আদৃত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার এত মর্যাদা আছে, কিন্তু তিনি ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভেব জন্ত আদৌ আগ্রহান্বিত নহেন। তিনি সর্বদাই দূবে থাকিতে চাহেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্বে, অথবা পবে তিনি আইন পবিষদে প্রবেশ করিয়া পার্টিব নেতা বা পরিচালক হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এই সব পন্থা সম্বন্ধে পবিহার কবিয়া চলেন। দেশবন্ধু চিত্তবন্ধন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সর্বদাই তাঁহার পবামর্শ গ্রহণ করিতেন। কোন জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে মওলানা আজাদেব উপদেশ গ্রহণ না করিয়া তাঁহার অগ্রসব হইতেন না। মওলানা আজাদ সামনে না থাকিয়া পশ্চাতে পবামর্শদাতারূপে থাকিতেই বেশী পছন্দ করেন। সহজে কোন ব্যাপাবেব পুরোভাগে আসিতে চাহেন না।

লেখাপড়াব চর্চা ও জ্ঞানেব সাধনাই তাঁহার একমাত্র বিলাস। পুস্তক

ও গবেষণার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে তিনি দিনে পর দিন পবন আনন্দে কাটাইয়া দিতে পাবেন। মওলানা আজাদ আববী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি যখন কথা বলেন, তখন মনে হয় যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে এক মহিমময়ী বাণী উচ্চাৰিত হইতেছে। তিনি সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলেন। তিনি যথাস্থানে যথা শব্দ ব্যবহার করিতে কখনও বিস্মৃত হন না। সাধারণ কথার মধ্যে তিনি মাঝে মাঝে এমন সব উপমা ব্যবহার করেন, যাহা প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী হয়। এমন উপমাবহুল কথা খুব কম লোক বলিতে পারে। একদা শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইসেব সহিত তাঁহার কি একটা বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। দেশাই মহাশয় তাঁহাকে জনসাধারণের সরল বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই সরল বিশ্বাসের কারণে তিনি সাফল্যের সহিত কতিপয় সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম হন, ইহাতে মওলানা আজাদ একটা উপমা দিয়া বিষয়টাকে সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন : “কিন্তু অসুবিধা এই যে, ধর্মবিশ্বাস এমন একটা শক্তি যাহার অপব্যবহার করিলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী হয়। একটি আনাড়ী গাডোয়ানের হাতে একটা গরুগাড়ি পড়িলে দুর্ভিপাক হইতে পারে। ইহাতে হয়ত চালকের কিছু ক্ষতি হইতে পারে, অথবা অন্য দু’একজনের সামান্য ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু বেলগুয়ে, দুর্ঘটনা হইতে কি ভয়ানক সর্বনাশ হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহাতে শত শত জীবন নষ্ট হয়; ধনসম্পত্তিরও বহু অনিষ্ট হয়। ধর্ম এই শক্তিশালী এন্জিনের মত তাহা সর্বদা সুদক্ষ ও সদাজাগ্রত চালকের হাতে থাকা দরকার। অযোগ্য চালকের হাতে পড়িলে ইহা হইতে নানা

দুর্ঘটনা হইতে পাবে। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, আজ ধর্ম এই ধবনের অযোগ্য লোকের হাতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাহারা ইহাকে অধর্মের পরিণত করিয়াছে এবং আমরাও বুঝিতে পারি না, আমরা কোথায় যাইতেছি।”

অনেকের ধারণা এই যে, মওলানা আজাদ ইংরেজি জানেন না, কিন্তু ইহা সত্য নহে। তিনি ইংবেজি কথা খুব কম বলেন, যদিও তিনি ইংরেজি খুব ভাল জানেন। তাঁহার গৃহেব পুস্তকাগার ইংরেজি ও ফরাসী ভাষার ক্লাসিক গ্রন্থে পূর্ণ। তিনি অনেক ইংবেজ কবিদের গ্রন্থ বহুবাব পড়িয়াছেন। সেক্সপিয়াব, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, বাইবন প্রভৃতি কবিদের বহু গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। জগতের বড় বড় চিন্তাবীরেব যুগান্তকারী গ্রন্থাবলী তাঁহার পাঠাগারে স্থান পাইয়াছে। গ্যোটে, স্পিনোজা, রুশো, ভলটেয়ার, কার্লমার্ক্স, হাভলক এলিস—এ সব লেখকের গ্রন্থ তাঁহার পাঠাগারে আছে। উপনিষদ, বেদ, গীতা এ সবও আছে। People of All Nations Seriesএব সমুদয় গ্রন্থ, Historian's History of the World, Inter-national Library of Famous Literatureএব সমুদয় গ্রন্থ তাঁহার পাঠাগারে আছে। স্কটের ওয়েভাবলি নভেলের সমস্ত বইগুলি তিনি পড়িয়াছেন। ডুমাব গ্রন্থ, হিউগোব গ্রন্থ এবং ফরাসী বিপ্লবেব যুগেব কবি ও লেখকদের বহু গ্রন্থ তিনি একাধিকবাব পড়িয়াছেন। ইতিহাস ও দর্শনের গ্রন্থগুলিই তিনি বেশী পছন্দ করেন। হিন্দু দর্শনেব বহু গ্রন্থ বিশেষ করিয়া ন্যায় বৈশেশিক দর্শনেব গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াছেন। আবার ম্যাডাম জিয়ান পম্পাদের গ্রন্থ তিনি পড়িয়াছেন।

১২২ মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ

হুজুরত মহম্মদ ও হুজুরত ওমর সম্পর্কীয় সৃষ্টি প্রকাশিত গ্রন্থ তাঁহার টেবিলে আছে,—আব তাহাবই পার্শ্বে Flaubert ও Madame Bovary গ্রন্থ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত আববী, ফারসী ও তুর্কি সাহিত্যের বহু গ্রন্থ তাঁহার টেবিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহাদের নাম এ দেশের বহু 'আলেম' এখনও জানেন না।

মওলানা আজাদ সকলের সহিত খুব মেলামেশা করিতেন না। কিন্তু তিনি চিঠিপত্রের দ্বারা বহির্জগতের সহিত অলাপ-আলোচনা করিতেন এবং এইভাবে অনেক বিশ্ববিখ্যাত মহাজনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। এই শ্রেণীর যে সব লোকের সহিত তিনি পত্রালাপ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে মিশরের জগলুল পাশা ও ফতেহ বে তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। মিশরে থাকিবার কালে তিনি ইহাদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি তুরস্কের কামাল পাশা ও অন্যান্য নেতাদের সংস্পর্শে ছিলেন। প্রাচীন ও নব্য তুরস্কের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। ১৯০৮ সালে নব্য তুরস্কের যে সব নেতা Committee of Union and Progress গঠন করেন এবং যাহারা দেশে বিপ্লব আনয়ন করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তুর্কি প্যারলামেন্টের স্পীকার আহমদ রেজা, ডাঃ সালাহউদ্দিন, আনওয়ার পাশা, জাবিদ বে—ইহাদের সহিত চিঠিপত্র বিনিময় করিতেন। ইহাদের প্রগতিপন্থী দলের বিখ্যাত নেতা তাকি জাদেহ তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু। মওলানা আজাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা কঠোর সংরক্ষিত ভাব আছে বলিয়া অনেকে তাঁহার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সংবাদ রাখেন না। কিন্তু তিনি সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া পৃথিবীর বহু সংবাদ রাখেন।

যাহাব। তাঁহাকে বুঝিয়াছে, তাহাব। তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ কবিত্তে কুণ্ঠিত হয় না।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-প্রণালী অতি সাদাসিধে ধরণের। তাঁহার গৃহে আসবাবপত্রের ছড়াচড়ি নাই। তাঁহার অফিস গৃহে ও ড্রইং রুমে বাশি বাশি পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইবে না। বদ অভ্যাসের মধ্যে সিগারেটেই তাঁহার আসক্তি। এ ছাড়া অন্য কোন অভ্যাস তাঁহার নাই। যখন কাবাগাবে যান, তখন তাহাও ছাড়িয়া দেন। তিনি প্রত্যাষে উঠেন। তিনি কোন আমোদ-প্রমোদের স্থানে যান না। সযত্নে সমস্ত প্রকার শোভাযাত্রা পরিচাল্য কবেন। তিনি একজন উচ্চ দরের বক্তা, কিন্তু demagogue নহেন। বিতর্ক সভায় তিনি সংযতভাবে প্রতিপক্ষের উত্তর দেন। কমিটি রুমে তাঁহার বাগ্মীতার চরম বিকাশ হয়। সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ সবল অন্তর্ভেদী বাগ্মীতার দ্বারা সভাগৃহকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পাবেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণের লোক নহেন। তাই জনসাধারণ তাঁহাকে বুঝে না।

সমাপ্ত ০

পরিশিষ্ট

ସଂକଳାନାର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

প্রায় ত্রিশ বৎসব পূর্বে (১৯১২ খৃষ্টাব্দে) মনীষী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ভাবতেব লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ও সম্মোহিত মুসলমানদিগকে তীব্র কশাঘাত কবিয়া তাহাদের আশু মুক্তির জন্য “আল্-হেলান্” পত্রে একটি প্রবন্ধে যে পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান মুসলমানগণের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই তাহার কিয়দংশ অনুবাদ সহ নিম্নে দেওয়া গেল।

جو ہوئے والا ہے اسکو کوئی قوم اپنی نھوست سے نہیں روک سکتی - یقیناً ایک دن آئیگا ، جنکے ہندوستان کا آخری سیاسی انقلاب ہو چکا ہوگا ، علامی کی رہ پڑیاں جو اس ے خود اپنے ہاتوں میں ڈال لی ہیں ، بیسویں صدی کی ہوائے حریت کی تیغ سے کت کر گر چکی ہونگی ، اور وہ سب کچھ ہو چکے گا ، جس کا ہونا ضروری ہے - دوس کیجئے کہ اس وقت ہندوستان کی مالکی ترقی کی ایک تاریخ لکھی گئی ، تو آپکو معلوم ہے کہ اسمیں ہندوستان ے سات کروڑ انسانوں کی نسبت کیا لکھا جائے گا ؟

اسمیں لکھا جائے گا کہ ایک بدبظ اور زہر طالع قوم ، جو ہمیشہ ملکی ترقی کیلئے ایک روک ، ملک کی فلاح کیلئے ایک بدقسمتی ، راہ آزادی میں سنگ گراں ، حاکمانہ طمع کا کھولنا ، دست اجانب میں باریچہ لعب ، ہندوستان کی ہدشائی پر ایک گہرا زخم ، اور کورنصت کے ہاتھ میں ملک کی اصدکوں کو ہامال کر کے کیلئے ایک پتھر بندھ رہی ۱۱

اسمیں لکھا جائے گا کہ ایک عامل رحم مگر مسحور انسان کا کُلہ جسکے ہر مرد کو کسی زبردست کاہن نے اپنے مندر سے جاوڑ بدادیا تھا ، جو اپنے بچانے والے آقا کے ہاتھ میں اپنے گردن کی رسی دیکھتی تھی اور حوش ہوتی تھی ، جسمیں کوئی انسانی ارادہ ، کوئی انسانی دماغ ، کوئی انسانی حرکت ، اور کوئی انسانی زندگی کا ثبوت نہ تھا ۔ جو نہ اپنے دماغ سے سرچ سکی تھی نہ اپنی اراد سے دل سکتی تھی ، اپنے ہاتھوں سے چل سکتی تھی ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ سمجھ کر اٹھا سکتی تھی ایک معدول ، جو مسمرائزر کے ارادے پر زندہ ہو ۔ ایک محدود شل ، جو صرف زمین کیلئے بار ہو ایک درخت ، جو حرکت کیلئے ہوا متطرح ہو ، ایک پتھر جو بعد کسی دی روح کے حرکت دیے ہل نہ سکتا ہو ، اور سب سے آخر یہ کہ ایک بدعتی کا داع جو انسانیت کی پیروی پر ہو ۔

پھر اسمیں لکھا جائے گا کہ نہ حالت اس قوم کی تھی ، جو آہ ثَم آہ کہ ”مسلم“ تھی ، جو اپنے ساتھ انسانی شرف و جلال کی ایک عظیم ترین تاریخ رکھتی تھی ، جسکو دنیا کی وراثت اور خلافت دی گئی تھی ، جو دنیا میں اسلئے بھیجی گئی تھی ، تاکہ انسانی استعداد و استعداد کی رعیتوں سے بددگان الہی کو آزاد کرائے ۔ جو اسلئے بھیجی گئی تھی کہ دیزوں کو کاٹے ، نہ اسلئے کہ خود اپنے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنے ، جو اسلئے آئی تھی کہ تمام اُس رعیتوں کو ، جو خدا کی مسدگی کے سوا اور شیطانی قوتوں کی (اور ہر وہ استبداد جو اللہ کے ماسوا ہے ، اسلام کی اصطلاح میں بھی نام رکھتا ہے) انساں کی گردنوں میں پڑی ہیں ، ٹکڑے ٹکڑے کر دئے ، نہ اسلئے کہ سب سے پہلی رعیت کو خود ہی اپنی گردن کا ربور بنائے ۔ جو خدا کی نائب اور حلیفہ تھی ۔ تاکہ دنیا کو اپنا معکوم بنائے ۔ نہ نہ کہ خود معکومی پر نار کرے ۔ جسکے قدموں پر قوموں کو گریا تھا تاکہ وہ اٹھائے ۔ نہ یہ کہ وہ خود خاک مدلت و علامی پر لوٹے اور ٹھکرائی جائے ۔

جو اس ملت حنیفی کی پیرو تھی ، جو دنیا میں صرف اسلئے ہے کہ حاکم ہو ۔ نہ اسلئے کہ علام و مملوک ہو ۔ آہ ! جو ”مسلم“ بھی اور پھر کوسا

انسانی شرف نامی رہندا ہے ، جو اس اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے خطاب محبوب و اقدس میں بہیں ہے ؟ جو ”مسلم“ تھی اور اسلئے قدرتی طور پر اسکا فرض تھا کہ ہندوستان میں و سب کچھ کرتی ، جو اوروں نے کیا ، اور جسکو اپنے وجود میں سے اس نے ہمسہ روکا ۔ جو ”مسلم“ بھی ۔ پس چاہیے تھا کہ ہندوستان کی آزادی اور ملک کی ترقی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہونا ، اور ہندوستان کی تمام قومیں اس کے پیچھے پیچھے ہوں کہ وہ اس کے پاس ”اسلام“ تھا اور ”اسلام“ آگے رہے کہلنے لگے ۔ پیچھے رہے کیلئے نہیں ۔ وہ ایک قوم ہے تاکہ قومیں اس کے آگے چھ کر روحانی و جسمانی نجات پائیں پھر وہ کسی کے آگے چھلنے کا محتاج نہیں ہے ۔

آہ ! اے لوگو کہ میں نہیں سمجھتا ہم کو کدا کہوں ، معکو خدا را بگلاؤ کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم دین و دہم کے پسر و ، خطاب اسلام سے متصف ، اور امامت الہی کے حامل ہو ، یہ سچ ہے تو ہم صرف اسلئے ہو تاکہ نذر ہو ، کے خوف ہو ، حری ہو ، آزاد ہو ، خود مختار ہو ، نہ صرف اقتدائی کہ خود آزاد ہو ، بلکہ قوموں کو آزادی بخشنے والے اور ملکوں کو بد استعداد سے نجات دلانے والے ہو ، اور میں آگے بڑھتا ہوں کہ تم اسلئے ہو ، تاکہ خاوروش ہو ، تاکہ راہ حق میں سر نکھ ہو پھر یہ کیا ہے کہ یہ سب باتیں عدروں میں دیکھتا ہوں ، لیکن اے مددگار ! تم اس سے معروم ہو ۔ یہ کیا دوالعجبی اور کیا تمنا ہے عمل سور ہے ؟

اگر ہم کہو کہ تاریخ ہند میں ہمارے لئے بھی ایک شرف و عظمی کا باب ہوگا تو تم خاموش رہو ، اور مجھ سے کہو کہ میں آگے پڑھوں ۔ بیشک ایک باب ہوگا ، مگر جانتے ہو کہ اس میں کیا ہوگا ؟ اس میں لکھا ہوگا کہ ہندوستان ملکی ترقی اور ملکی آزادی کی راہ میں بڑھا ، ہندوؤں نے اس کے لئے اپنے سروں کو ہتیلی پر رکھا ، مگر مسلمان عاروں کے اندر چھپ گئے ۔ انہوں نے ہکارا ، مگر انہوں نے اپنے منہ اور زبان پر فعل چڑھادے ۔ ملک عدم صفاہ قوابس کاشاکی تھا ، ہندوؤں نے اس کے لئے جہاد شروع کیا ، پھر اس قوم مجاہد نے بھی نہیں کیا کہ صرف چپ رہی ، بلکہ مجہدوانہ چیم اڑھی کہ تمام کام کرے والے باقی ہوں ۔

یہ اور ایسے ہی حالت تھے حمیں ملک و مملکت تھا ۔ ہندو آئیں اور انہوں نے اپنی تمام قوتوں کو ملکی جہاد کے لئے وقف کر دیا ۔ لیکن عین اُس وقت جبکہ وہ سب کچھ کر رہے تھے ، مسلمانوں نے نہ صرف اپنے ہی ہاتھ پاؤں توڑے ، بلکہ چاہا کہ جبکہ ہاتھ پاؤں ہیں ، انکو بھی اہدا ہی سا لولا لنگڑا دیا دیں ۔ جبکہ وہ ملک اور ملک کی آزادی کی آگ سلگا رہے تھے ، تو یہ عالم کی ایک تہذیبی لاش لٹکے بدلتے تھے ، انکے کانوں میں حادو کا صدتر پھوسکدیا گدا تھا کہ ” وقت نہیں آیا “ اور وہ اسی میں مسعور رہے ۔ ابی الف لیلہ کا عفریت تھا ، جس نے حادو کے زور سے انکو پھر کی حقائق بنا دیا تھا ، پس نہ ملک کی ترقی کی راہ میں روک بند کر پڑے نہ ۔

اسکے بعد وہ آئے والا مورخ جو ہندوستان کا وفائع نگار ہوگا ، لکھے گا کہ بالآخر وہ سب کچھ ہوا جو ہونا تھا ، بدسیروں صدی میں کوی ملک علام نہیں رہسکتا تھا اور نہیں رہا ، برڈش گورنمنٹ ایک کانس ڈیوشنل گورنمنٹ تھی ، چنگیسر خاں کا بدعت قہر نہ تھا ۔ پس ملک آزاد ہوا اور انگلستان نے اہدا فرض ادا کر دیا ۔ لکن دنیا یاد رکھے کہ جو کچھ ہوا ، اُس قزم ہی سروروشی سے ہوا ، جو مسلم نہ بھی ، ہر جو ” مسلم “ تھے ، انہوں نے ہمیشہ آزادی کی حکمہ علامی کی ، اور سر بلندی کی حکمہ متعدد مدلت کی کوشش کی ۔ ہندوستان کی ملکی بدعت بعداً ابی عطمت اور عرت کی دادگار ہے ، لکن اس عرت میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ۔ اگر ملک کے قوانین کی ترمیم ہوئی ، نئے معید قوانین بنائے گئے ، بریادکی معصولوں اور گندکسوں سے انسانوں کے بدعت پائی ۔ بعدم حدی اور عام ہوئی ، موحی مصارف میں تعصیف ہوئی اور سب سے تحریر کہ ملک کو حکومت خود اختیاری ملی ، تو صرف ہندو فائل عرت ہندو ، مسلمانوں کے لئے ناربانہ عبت ہندو کی وجہ سے ، کیونکہ انہوں نے پالٹیکس کو شروع بنا اور پھر پالٹیکس اسی کو سمجھا ، مگر مسلمانوں نے اسکو معصیت سمجھکر کدارہ کشی کی ، اور جب شروع بھی کدا تو شیطان نے یہ سمجھایا کہ گورنمنٹ کے آگے سجدہ کریں ، یا اسکے آگے ہنک مانگے کھائے روئیں ، اور پھر مانگس بھی تو اشرمی نہیں ، چادری سونا نہیں ، لعل و چراہر نہیں ، بلکہ نابیسے کا ایک رنگ آلودہ ٹکرا ، نا سوکھی

روٹی کے چند ربڑے ' دل کی مڈل القوم الدین کدوا دادا' فاقصص العصص لعلم
یتفکرون (۷ : ۱۷۵)

بدشک مدتوں کے بعد بدد توتے ' حس کو کھر کھا تھا اسکے ثواب و طاعت ہرے
کا فکرو دیدا پڑا ' لیکن کدو بکرو ؟ اہلی موت سے اپنے دماغ سے ' اہلی ہستی
اور اہلی روح سے ؟ نہیں ناسکھ ع ان ہم سعی عمرہ مردم شکار دوسب '

پہلے حدکے حکم سے گمنامی کی عاروں میں چھپے تھے ' اب اہلی کے حکم
سے باہر نکلے ناکہ مدد میں جا کر انکے آگے سرستود ہوں - بدشک شملہ
قیچو تدش کے تماشے کے بعد اسکا آخری پارت کھیلا گیا اور اسکا نام " لیگ " رکھا
گیا ' لیکن اگر تم ایک طرف جانہ بنا کر اسکا نام آتشدہ رکھو گے ' تو کیا طرف
دی سل آگ کا انگارہ ہو جائے گی ؟ اگر تم ایک کھلے کا پتلا بکھر اسکے سدے
کے پاس کی کل کو انگوٹھے سے دباؤ گی ' ناکہ اپنے دروں ہاتھ ہلا کر تالی
بجائے ' دو کدا اس تماشے سے وہ انسان کا بچہ سمجھ لیا جائے گا ؟ داداؤں '
جب کدوں ہو ؟ مچھکو جواب دوا شاید ہی سخت دنیا میں کسی قوم سے
پالٹکس کی ادسی صریح بدلل و تودھن کی ہوگی ' جدسی کہ چھ سال تک
دم کے کی - دم کے ' اے چاندی اور سونے کو پوچھنے والو ' تم کے کی -
تمہارا وجود یکسر سیاست کی تعمیر - اور تمہارے اعمال اسکی معرر پدشانی پر
ایک کلاس کا ٹیکا ہیں - تم کے علامی کا ایک نیکدہ دادا ' اور اسکا نام سیاست
کی مستعد رکھا - دم کے سعدے کا سر جھکانا ' ور قوم کو دھوکا دیا کہ ہم عزت
کا سر بلند کر رہے ہیں - تم بدلل میں اپنے پاؤں ڈالکر کر رہے تھے ' تاکہ اور
حسب و عرق ہو ' لیکن قوم کو کہتے تھے کہ ہم منداناں میں دوڑ رہے ہیں -
تم خود گمراہ تھے ' پھر اس پر دس نہ کی اور پوری قوم کو گمراہ کرنا چاہا - صلاوا
فاصلوا موبل لہم ولا تناعہم -

ہندو مسلمانوں کا سوال بھی ایک باریگر کا کھیل ہے ' اور بدبختی سے
ناچنے والے ناچ رہے ہیں - یہ خیال کہ " تم نے ابھی تعلیم میں ترقی نہیں کی '
اسلیئے تمہارا پالٹکس یہی ہے کہ بچے ہندوں سے اپنے عصب کردہ حقوق چھین لو "
اور کرو کہ حریف شاطر کی کس قدامت کی چال تھی ؟

سرا رکھا کی امانت کی چال تھی ؟

ছিল। সে পৃথিবিতে এই জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল যেন সে আল্লার সৃষ্ট জীবকে স্বাধীন করে। দাস ও পরাধীন হইবার জন্ত সে পৃথিবীতে প্রেরিত হয় নাই। যে জাতি মুসলমান তাহারই স্বাধীনতার পতাকা হস্তে ধারণ করা সর্ব্বাঙ্গে কর্তব্য ছিল। দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও স্বাধীনতার জন্ত হিন্দুগণ তাহাদের সর্ব্বশ পণ করিয়াছিল, আব মুসলমানগণ গহ্বরের মধ্যে লুকাইল। হিন্দুগণ জেহাদ শুরু করিল, আব মুসলমানগণ কেবল নীরব বহিল না, বরং উগ্রাদের মত চিংকাব করিষা উঠিল যে, উক্ত দেশ-কর্ণিগণ বিদ্রোহী।

বিংশ শতাব্দীতে কোন দেশই পরাধীন থাকিতে পাবে না, এবং থাকিবেও না। অরণ রাখিবেন—ভারতে বাহা কিছু হইবে তাহা সেই জাতির আত্মত্যাগে হইবে—বাহাবা মুসলমান নহে। বাহারা মুসলমান ছিল তাহার সর্ব্বদা স্বাধীনতার স্থানে গোলামীকে বরণ করিয়াছিল। ভারতের যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহা সম্মানীয় হিন্দুদেব দ্বারাই হইয়াছে এবং শয়তান মুসলমানদিগকে এই বুঝাইল যে, গবর্ণমেন্টের সামনে যেন তাহার মাথা নত করে, অথবা ক্রন্দন সহকাবে ভিক্ষা করে।

নিশ্চয় শিমলা ডেপুটেশনের তামাশাব পর উহাব শেষ খেলা হইল এবং উহার নাম রাখা হইল “লীগ”। হিন্দু-মুসলমানের সমস্ত এক হৃদয় যাত্রকের খেলা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমাকে সে এই বলিয়া নাচাইতেছে যে, “তোমরা এখনও শিক্ষায় উন্নতি লাভ করিতে পার নাই। তাই হিন্দুদের নিকট হইতে তোমাদের অধিকার সর্ব্বাঙ্গে ছিনাইয়া লওয়া কর্তব্য।”

“হিন্দু মেজরিটির” যে ভূত তোমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, দোহাই খোদা, তাহা এক্ষণে দূরে নিক্ষেপ কবিয়া দাও। ইহা শয়তানী মনোভাব বাহা মুসলমানের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা হইয়াছে। শক্তি কেবল সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বরং অস্তিত্ব বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে। সংখ্যার অল্পতা ও আধিক্যের উপর ইসলামের শক্তি কখনও নির্ভর করে নাই। বাহার অস্তরে ইসলাম বিবাজ কবিবে, সে কখনও সংখ্যাধিকো বিভ্রান্ত হইবে না।

অরণ রাখিবেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত প্রচেষ্টা হিন্দুদেব পক্ষে স্বদেশ-প্রেমের অন্তর্গত। আর উহা মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্মীয় ফরজ অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কাজ এবং “আল্লার জন্ত প্রচেষ্টার” অন্তর্গত।

সত্যের জন্ত সংগ্রাম এবং মানবকে স্বাধীন ও মুক্ত করা তো ইসলামের শাস্ত, চিরন্তন “মিশন”। এক্ষণে উঠ, জাগ্রত হও, আল্লার পথে অগ্রসব হও। (আল হেলাল, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল)

